# ংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৭৩

P-3669

# সংশোধনী

| পৃষ্ঠা | প্যারা | লাইন | মুদ্রিত পাঠ | শুদ্ধ পাঠ |
|---|---|---|---|---|
| ৭ | ১ | ৮ | ১৪৩·১৬ | ১৩৪·১৬ |
| ৯ | ৬ | ২ | ২৩·৪ | ২৪·৩ |
| ১২ | ২ | ৪ | তো যে | ওরা যে |
| ২৩ | ২ | ১ | পুনর্বাসন | পুনর্বাসন |
| ২৭ | ১ | ১ | পুনর্জীবন | পুনরুজ্জীবন |
| ৩২ | ৫ | ২ | এতেষা | এষণা |
| ৩৩ | ২ | ১ | ১৯৭৩ | ১৯৭২ |
| ৩৩ | ২ | ৪ | ৫১·৪৬ | ৫৫·৪৩ |
| ৩৭ | ২ | ৪ | ৬৬ ভাগ থেকে শতকরা ৪৩ ভাগে | শতকরা ৪৩ ভাগ |
| ৩৭ | ৯ | ১ | ১৩ | '১৩ |
| ৪৩ | ৪ | ১ | ১৯৭৫ | ১৯৭২ |
| ৪৬ | ৬ | ৩ | '৭২ | '৭২ কোটি |

# বাংলাদেশ ব্যাংক

EA 4/11/77
P-3669

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের
৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের কার্যবিবরণী ও হিসাবসমূহ

# বাংলাদেশ ব্যাংক

গভর্নর

আ. ন. হামিদুল্লাহ

ডিপুটি গভর্নর
কে. এ. রশীদ

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
এ. এম. এ. রহিম

**কার্যকরী পরিচালকবৃন্দ**

এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায়

এ. এম. আমিনুল হক চৌধুরী

এম. খালিদ খান

| | |
|---|---|
| হিসাব রক্ষণ বিভাগ | |
| এল. কিউ. চৌধুরী | পরিচালক |
| কৃষি ঋণ বিভাগ | |
| এস. এ. কবির | প্রধান অফিসার |
| ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ বিভাগ | |
| এ. টি. এম. আমিন | প্রধান অফিসার |
| শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ | |
| এস. এ. কবির | পরিচালক |
| প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগ | |
| এম. এ. হক | পরিচালক |
| বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ | |
| এম. ইজাদুর রহমান | নিয়ন্ত্রক |
| পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ | |
| এ. ও. এম. শামসুদ্দোহা | পরিচালক |
| গণ-সংযোগ বিভাগ | |
| শাহাবুদ্দিন আহমেদ | পরিচালক |

গবেষণা বিভাগ

| | |
|---|---|
| এ. এইচ. এম. নুরুদ্দীন চৌধুরী | পরিচালক |

সম্পাদকের বিভাগ

| | |
|---|---|
| এ. আর. চৌধুরী | সম্পাদক |

পরিসংখ্যান বিভাগ

| | |
|---|---|
| নাজিমউদ্দীন খাজা | পরিচালক |

**ব্যাংকের অফিসসমূহ**

| | | |
|---|---|---|
| ঢাকা | এম. এ. খান | ব্যবস্থাপক |
| চট্টগ্রাম | বি. এম. আহমেদ | ব্যবস্থাপক |
| খুলনা | কিউ. এ. তাহির | ব্যবস্থাপক |
| বগুড়া | এস. এম. এ. এইচ আনসারী | ব্যবস্থাপক |
| রাজশাহী | এম. এ. কাশেম | সহকারী নিয়ন্ত্রক |
| সিলেট | এস. বি. কে. চৌধুরী | সহকারী নিয়ন্ত্রক |

# সূচীপত্র


| | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | মুখবন্ধ | | ১ |
| ২। | প্রথম অধ্যায় | বাংলাদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পর্যালোচনা | ৩ |
| | | ১। সাধারণ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা | ৫ |
| | | ২। খাদ্য পরিস্থিতি | ৮ |
| | | ৩। পণ্যের বাজার | ৯ |
| | | কাঁচাপাট | ৯ |
| | | চা | ১০ |
| | | পশুচর্ম ও চামড়া | ১১ |
| | | ৪। শিল্প উৎপাদন | ১২ |
| | | ৫। দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি ও জীবনধারণের ব্যয় | ১৩ |
| ৩। | দ্বিতীয় অধ্যায় | অর্থ ও ঋণ | ১৫ |
| | | ১। অর্থ-সরবরাহ | ১৭ |
| | | ২। ব্যাংকিং ও ঋণ পরিস্থিতি | ১৯ |
| | | ৩। ব্যাংকের হার | ২০ |
| | | ৪। সুদের হার | ২০ |
| | | ৫। তলবী অর্থের বাজার | ২১ |
| | | ৬। কৃষি ঋণ | ২১ |
| | | ৭। চা শিল্পে অর্থযোগান | ২২ |
| | | ৮। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ | ২৩ |
| ৪। | তৃতীয় অধ্যায় | ব্যাংক ব্যবসার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন | ২৫ |
| | | ১। ব্যাংক-ব্যবসার পুনরুজ্জীবন | ২৭ |
| | | ২। ব্যাংক জাতীয়করণ ও নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা | ২৯ |
| | | ৩। ব্যাংক ব্যবসার অগ্রগতি | ৩১ |
| | | ৪। ব্যাংক পরিদর্শন | ৩২ |
| | | ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক | ৩২ |
| | | খ) সমবায় ব্যাংক | ৩২ |

| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৫। চতুর্থ অধ্যায় | জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থা ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় নীতি | ৩৩ |
| | ১। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট | ৩৫ |
| | ২। রেলওয়ে বাজেট | ৩৮ |
| | ৩। সরকারের ঋণ | ৩৯ |
| | ৪। শিল্প জাতীয়করণ | ৪০ |
| | ৫। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ | ৪০ |
| | ৬। সঞ্চয়-পত্রের পুনর্বৈধকরণ | ৪১ |
| ৬। পঞ্চম অধ্যায় | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক | ৪৩ |
| | ১। বাণিজ্য ও পরিশোধ চুক্তি | ৪৫ |
| | ২। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ | ৪৬ |
| | ৩। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে লেনদেন | ৪৬ |
| | ৪। বিনিময় হার | ৪৬ |
| | ৫। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ | ৪৮ |
| | ৬। আমদানী নীতি | ৪৯ |
| ৭। ষষ্ঠ অধ্যায় | প্রশাসন, মুদ্রা ও হিসাব | ৫৩ |
| | ১। গভর্নর নিয়োগ | ৫৫ |
| | ২। চাকরির শর্তাবলীর উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কাজ | ৫৫ |
| | ৩। ব্যাংক ব্যবসায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ | ৫৫ |
| | ৪। কার্যালয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা | ৫৬ |
| | ৫। ব্যাংক নোট | ৫৬ |
| | ৬। মুদ্রা প্রত্যাহার | ৫৬ |
| | ৭। মুদ্রা | ৫৮ |
| | ৮। ব্যাংকিং বিভাগ | ৫৮ |
| | ৯। ইস্যু বিভাগ | ৫৯ |
| | ১০। বার্ষিক হিসাব | ৫৯ |
| | ১১। নিরীক্ষক নিয়োগ | ৬০ |
| | ১২। সর্বশেষ | ৬০ |

# মুখবন্ধ

১৯৭১ সালের শেষভাগে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'ষ্টেট ব্যাংক অব্ পাকিস্তান' এই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করতো। ঢাকায় তখন ডিপুটি গভর্ণরের একটা কার্যালয় ছিলো মাত্র। এর অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়ায় একটা করে শাখা কার্যালয় ছিলো। সিলেট ও রাজশাহীতে একটা করে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ শাখা কাজ করতো। ব্যাংকের গভর্ণর, কেন্দ্রীয় পরিচালক মণ্ডলীর দফতর ও কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা করাচী থেকে কাজ করতেন। তাই করাচীতে একটা ব্যাপক সংগঠনও গড়ে উঠেছিলো। মুদ্রা ও ব্যাংক-ব্যবসা সম্বন্ধীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো তাই তৎকালীন করাচী অথবা ইসলামাবাদস্থ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রভাবিত হোত। যদিও তা এই অঞ্চলে একইভাবে প্রযোজ্য ছিলো। অধীনস্থ আঞ্চলিক প্রধান কার্যালয় হিসেবে ঢাকাস্থ ডিপুটি গভর্ণরের কার্যালয় প্রধানতঃ করাচীর নির্দেশাবলীই মেনে চলতো। এই অঞ্চলের স্বার্থরক্ষাকারী কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কার্যতঃ ঢাকাস্থ কার্যালয়ের কোন বক্তব্য থাকতো না। তবু ঢাকা কার্যালয় মাঝে-মধ্যেই তাদের মূল্যবান মতামত কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টিগোচর করতো।

দেশ সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার পর এই অঞ্চলের অতিশয় ক্ষুদ্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাঠামোকেই সারা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। বিধ্বস্ত অর্থনীতি, মুদ্রা ব্যবস্থার অভাব ও ভগ্ন ব্যাংকিং ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ তখন তার সামনে। উপস্থিত শ্রম ও যাবতীয় উপকরণকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ চালাবার জন্যে তৎক্ষণাৎ পুনর্গঠিত করতে হয়। অধিকন্তু, এই সবকিছু করতে আবার আইনের সম্মতির প্রয়োজন ছিলো। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে যথাসময়ে নজর দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে এই ব্যাপারে 'বাংলাদেশ ব্যাংক (অস্থায়ী) আদেশ' নামক রাষ্ট্রপতির একটি আদেশ জারি হোল। এই আদেশ কার্যতঃ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল থেকে কার্যকরী করা হয়। সরকার এরপরই একজন গভর্ণর নিয়োগ করেন। সাথে সাথে ব্যাংকের গভর্ণর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ভার হাতে নেন। ১৯৭১ সালের অস্থায়ী আদেশ পরবর্তীকালে তুলে নিয়ে ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর নতুন আর একটি 'বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ' জারি করা হয়।

১৯৭২ সালের সেই বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ৪০ নং ধারার ২নং উপধারা অনুযায়ী বর্তমান বার্ষিক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

# বাংলাদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পর্যালোচনা

## ১। সাধারণ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতির অন্যান্য উপ-কাঠামোগুলো হয় বিধ্বস্ত। সড়ক যোগাযোগ, রেলওয়ে, পুল, যানবাহন, জাহাজ-ষ্টিমার ও বন্দরের সুযোগ সুবিধাসহ প্রভূত যন্ত্রপাতি হয় বিনষ্ট। এরপর স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আবার বন্যা ও খরার জন্যে পর্যায়ক্রমে চারটি ফসলহানি ঘটে। যার ফলে প্রাথমিক হিসেবে দেখা যায় সত্যিকার অর্থে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন শতকরা ১২-১৪ ভাগ কম হয়। ১৯৭১ ও ১৯৭২ এই দুই সালেই কৃষি ও শিল্পের উভয় খাতেই উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেয়। কৃষি খাতে ১৯৬৯-৭০-এর স্বাভাবিক বছরের তুলনায় ১৯৭১-৭২ সালের আমন ফসল শতকরা ১৮ ভাগ কম হয়। ১৯৭১ সালের তুলনায় ১৯৭২ সালের বোরো ফসলও শতকরা ২০ভাগ কম হয়। ১৯৭২-৭৩ সালের প্রচণ্ড খরার ফলে আউস ও আমন এই উভয়েরই উৎপাদন কম হয়। ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ সালের বাৎসরিক গড় উৎপাদন ১১৩'১ লাখ টন চালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালের চাল উৎপাদন শতকরা ১১ ভাগ কম। ১৯৭২-৭৩ সালে মোট ৯৯'৪ লাখ টন চাল উৎপাদিত হয়েছিলো। ১৯৬৯-৭০ সালে যেখানে ৭৪ লাখ বেল কাঁচা পাট উৎপাদিত হয়, সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদিত হয় মাত্র ৬৬ লাখ বেল। চায়ের উৎপাদন যেখানে পূর্ববর্তী বছরগুলোতে বছরে ৬'৫ কোটি পাউণ্ড ছিলো, সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদিত হয়েছে মাত্র ৫'৩ কোটি পাউণ্ড। ১৯৭১-৭২ সালে চায়ের উৎপাদন অবশ্য আরো কম ছিলো। সে বছরে উৎপাদিত হয় মাত্র ২'৬ কোটি পাউণ্ড।

১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় শিল্প খাতে ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদন অবস্থা খুবই নাজুক ছিলো। একমাত্র পাটশিল্পেই ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমে যায় শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ। সুতা ও বস্ত্র শিল্পে, পক্ষান্তরে, কাপড় উৎপাদন শতকরা ৩ ভাগ ও সুতা উৎপাদন শতকরা ২৩ ভাগ কম হয়। চিনি শিল্পের অবস্থা আরো খারাপ যায়। ১৯৬৯-৭০-এর তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদিত হয় মাত্র শতকরা ২০ ভাগ চিনি। কিছু কিছু শিল্প যেমন সার, ষ্টিল, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদিতে অবশ্য ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে

উৎপাদন বেশী হয়। বৈদেশিক মুদ্রার আয় যা ১৯৭২-৭৩ সালে ২৭১ কোটি টাকা বলে হিসেব করা হয়েছে, তা ১৯৬৯-৭০ সালের সত্যিকার আয় থেকে অনেক কম। ১৯৬৯-৭০ সালে মোট প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছিলো। ১৯৭২-৭৩ সালের জন্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৬০ কোটি টাকার চেয়ে সত্যিকার বৈদেশিক মুদ্রার্জন অবশ্য কিছুটা বেশী।

১৯৭২-৭৩ সালে দ্রব্যমূল্য বেশ বেড়েছে। আভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদন ঘাটতি ও আমদানীস্বল্পতার ফলে মাল-পত্রের লভ্যতা অনেক কমে যায়। অপরপক্ষে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়ে যায়। কারণ, একদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের জন্যে ঋণ সরবরাহ করতে হয়, অন্যদিকে সরকারও তাঁর সাহায্য ও পুনর্বাসনের কর্মসূচীর জন্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করছেন। যোগাযোগ, পরিবহণ ও বন্টন ব্যবস্থার অসুবিধাদিও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মূল্য তারতম্যের অন্যতম কারণ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবেই ঢাকাস্থ একজন মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার (১৯৫৫-৫৬=১০০) ব্যয় ১৯৭২ সালে যেখানে ২৪৫ ছিলো, সেখানে ১৯৭৩ সালের মে মাসে তা ৩৬৪-তে এসে ঠেকেছে। অবশ্য, ১৯৭৩ সালের জুনে ব্যয় সামান্য কমে হয়েছে ৩৬১।

১৯৭২-৭৩ সালে অর্থসরবরাহ বেড়েছে ২১০'৩৩ কোটি টাকা। এবং মোট অর্থসরবরাহ ছিলো ৬৯৬'০৩ কোটি টাকা। অথচ ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল থেকে ৩০ শে জুন, ১৯৭২ সালের এই সময়টাতে অর্থসরবরাহ বেড়েছিলো মাত্র ৯৮'২০ কোটি টাকা। অর্থসরবরাহ বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ ছিলো দুটো। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রায়ত্তশিল্পে উৎপাদনমুখী ঋণের সম্প্রসারণ ও দ্বিতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক অধিকতর হারে ঋণগ্রহণ। ১৯৭২-৭৩ সালে ব্যাংক-ঋণও বেড়েছে বিপুলহারে। ব্যাংক-ঋণ ১৮৫'৯৪ কোটি টাকা বেড়ে হয়েছে ৬১২'৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৭২ সালের এই সময়ে ব্যাংক-ঋণ বেড়েছিলো মাত্র ১'৪৪ কোটি টাকা। ১৯৭১-৭২ সালে তপশিলী ব্যাংকগুলোতে সাধারণ আমানতের পরিমাণ ১৭৯'০৭ কোটি টাকা বেড়ে ৭০২'৬৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিলো। যেখানে স্বাধীনতার পর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৭২ সালে মোট ১৮৪'১৯ কোটি টাকার আমানত বেড়েছিলো। অপরপক্ষে ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়ে তপশিলী ব্যাংকগুলো কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কৃত ঋণের পরিমাণ যেখানে ২৭'৭৯ কোটি টাকা কমেছিলো, সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশ- ব্যাংক থেকে তপশিলী ব্যাংকগুলো কর্তৃক কৃত ঋণের পরিমাণ ৭'৭৪ কোটি টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬'৮৫ কোটি টাকায়।

১৯৭২-৭৩ আর্থিক বছরের প্রথম নয় মাসে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে মোট রপ্তানী আয় (সমুদ্র পথে) হয়েছে ১৯১'৫৯ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে একই সময়ে মোট আমদানীর পরিমাণ হচ্ছে ১৪০'৩২ কোটি টাকা। সেই হিসেবে উক্ত সময়ে আমাদের ৫১'২৭ কোটি টাকা পরিমাণের অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত হয়েছে। এই সময়ের প্রধান প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিলো—পাটজাতদ্রব্য (১০৫'৬৩ কোটি টাকা), কাঁচা পাট (৭০'৭১ কোটি টাকা) এবং চামড়া (১০'০২ কোটি টাকা)। স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে রপ্তানী আয় হয়েছে ১৪০'১৬ কোটি টাকা। কিন্তু আমদানী হয়েছে মোট ৩৪'৯৯ কোটি টাকার পণ্য-দ্রব্য। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত রপ্তানী আয় স্বাভাবিক বছরগুলোর গড় রপ্তানী আয়ের তুলনায় নিঃসন্দেহে কম ছিলো। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ঘাটতি ঘটে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা ও সমুদ্রগামী জাহাজের প্রাপ্যতার অভাবের দরুন। এই সময়ে আমদানী-স্বল্পতা ঘটেছে প্রধানতঃ বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অসুবিধার জন্যে।

**অন্যান্য অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ ছিলো :—**

(ক) অর্থ সমস্যা :

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই তখনো আর্থিকভাবে স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। এদের অনেকের ঘাড়েই ছিলো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ঋণের বোঝা। এমন কি তাদের অনেকেরই কার্যকরী মূলধনই ছিলো না।

(খ) যোগাযোগের অভাব :

অধিকাংশ পুল মেরামত ও কাজের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও এখনো যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠেনি। রেলওয়ে, আভ্যন্তরীণ নদীপথের যোগাযোগ, বাস ও ট্রাকের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। 'আনরব' কর্তৃক পর্যায়ক্রমে পরিবহণ তুলে নেয়ায় পরিবহণ প্রাপ্যতায় ঘাটতি পড়েছে। খাদ্যশস্যের জরুরীভিত্তিক পরিবহণ চাহিদা সমস্যাকে আরো জটিল করেছে। ফলে, বাণিজ্যিক ও শিল্প সংগঠনগুলো তাদের উৎপাদনের উপাদান কারখানায় পৌঁছাতে অসুবিধা ভোগ করছিলো—বাজারজাতকরণের সমস্যাও তারই সাথে দেখা দেয়।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অভাব :

নানাকারণে কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ, ভোগপণ্য ও অন্যান্য উপাদানের আমদানী বিঘ্নিত হচ্ছিলো। যেমন—(১) আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায়ের নিমিত্ত এজেন্সী মাধ্যমের অভাব, (২) বিদেশী ক্রেতা-বিক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে অভিজ্ঞ লোকের

অভাব। দক্ষতা ও যোগাযোগ রাতারাতি স্থাপন করা যায় না। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা এ ব্যাপারে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আমদানীর জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাতে অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে আসে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পর বাংলাদেশের কোন বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ছিলো না। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ আস্তে আস্তে তার বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করে নিয়েছে। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছিলো ১১০'৫০ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের ২৯শে জুনে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৫'৩৪ কোটি টাকা।

## ২। খাদ্য পরিস্থিতি

স্বাধীনতার পর থেকেই, বিশেষ করে ১৯৭২-৭৩ সালে খাদ্য পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। কারণ, এই সময়ে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য চালের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ সালের গড় বাৎসরিক উৎপাদন যেখানে ১১৩'১ লাখ টন ছিলো সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে চালের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে দাঁড়ায় ৯৯'৪ লাখ টনে। ১৯৭২-৭৩ সালের এই উৎপাদন ঘাটতির মূল কারণ ছিলো প্রচণ্ড খরা। তার সাথে যোগ হয় বীজ ও সার সংগ্রহ এবং বন্টনের অসুবিধা। একদিকে উৎপাদন হ্রাস, অন্যদিকে জনসংখ্যাবৃদ্ধি খাদ্য চাহিদা ও খাদ্যলভ্যতার এই ব্যবধানকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এই ব্যবধান এতো তীব্র আকার ধারণ করে যে, রেকর্ড পরিমাণ ২৯ লাখ টন চাল আমদানী করার পরেও মোট চাহিদা ও মোট প্রাপ্যতার মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ ব্যবধান থেকে যায়। ফলে, ১৯৭২-৭৩ সালে যেমন বেড়েছে চালের দাম, তেমন বেড়েছে অন্যান্য খাদ্যশস্যের দাম।

চালের সরবরাহ কম থাকায় স্বাধীনতার ঠিক পর পর সময়ের তুলনায় ১৯৭৩ সালের জুনের মধ্যে দেশে মোটা চালের গড় খুচরা দাম ক্রেতার পক্ষে মণপ্রতি ৪৪'৭৩ টাকা বেড়ে ৮৫'৩০ টাকা হয়েছে। মাঝারি চালের গড় দাম বেশীর পক্ষে মণপ্রতি একই সময়ে ৫৬'৯১ টাকা বেড়ে ১০১'৮৮ টাকা হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যে মোটা ও মাঝারি চালের দামে মণপ্রতি গড় বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ২৫'৬৪ ও ৩২'৬৮ টাকা। কোথাও কোথাও অবশ্য মোটা ও মাঝারি চালের মূল্য মণপ্রতি যথাক্রমে ১০০ ও ১২৫ টাকা ছিলো। দেশে স্বাধীনতার ঠিক পরপর যেখানে মোটা চালের গড়পড়তা খুচরা মূল্য ক্রেতার পক্ষে মণপ্রতি ৪০'৫৭ টাকা ছিলো ইত্যবসরে এর মূল্য শতকরা ১১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন শহরাঞ্চলে মোটা ও মাঝারি ধরনের চালের মূল্যে বেশ উঠা-নামা পরিলক্ষিত হয়েছে। তা প্রধানতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহনের অসুবিধার দরুন সৃষ্ট অনিয়মিত সরবরাহের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

## ৩। পণ্যের বাজার

১৯৭২-৭৩ সালে পণ্যের বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল ছিলো। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদা কাঁচা পাটের মূল্যকে স্থিতিশীল রাখে। ১৯৭২-৭৩ সালে চায়ের মূল্য গুণভেদে কিছুটা উঠা-নামা করেছে। পশুচর্ম ও চামড়ার মূল্য ধীরগতিতে সারা বছর ধরেই বেড়েছে।

**কাঁচাপাট :**

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাটউৎপাদক কৃষকশ্রেণী ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পাটচাষে বিঘ্ন ঘটে। তাই স্বাভাবিক উৎপাদন বাৎসরিক ৬৫ লাখ বেলের তুলনায় ১৯৭১-৭২ সালে উৎপাদিত হয় মাত্র ৪৫ লাখ বেল কাঁচাপাট। ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদনে অগ্রগতি সাধিত হয়। এবং স্বাধীনতার পর এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বছরে উৎপাদিত হয় ৬৬ লাখ বেল।

আভ্যন্তরীণভাবে কাঁচাপাট কেনা-বেচা বিঘ্নিত হয়। রপ্তানীও হয়ে ওঠে কঠিনতর। কারণ, যোগাযোগ ছিলো বিচ্ছিন্ন ও পরিবহণ ছিলো অপ্রতুল। বন্দরের অসুবিধা প্রথমদিকে খুব বড়ো ছিলো। কারণ, চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর ছিলো মাইন ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রে ভর্তি। ফলে, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীর আগে কাঁচাপাট রপ্তানীর কোন ব্যবস্থা করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে কাঁচাপাট রপ্তানী-ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। এবং বাংলাদেশ পাট রপ্তানি সংস্থা নামে একটা প্রতিষ্ঠানের উপর কাঁচাপাট রপ্তানীর দায়িত্ব দেয়া হয়।

একইভাবে পাটকলগুলোর কার্য তদারকী ও সমণ্বয়ের জন্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা' নামে আর একটা প্রতিষ্ঠানের। এর উপর পাটজাতদ্রব্য রপ্তানীর দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১৯৭১-৭২ সালের মোট ৪৫ লাখ বেল কাঁচা পাটের মধ্যে ১লা জুলাই, ১৯৭১ সাল থেকে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে মাত্র ২০·৫ লাখ বেল কাঁচা পাট আসে দেশের বিভিন্ন পাট-বেল কেন্দ্রে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধচলাকালীন সময়ে চোরাচালান ও নানাভাবে ধ্বংস হওয়ার ফলে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের বাজারে কাঁচা পাট আসে মাত্র ৮·২ লাখ বেল।

১৯৭২-৭৩ সালে পাট উৎপাদন বেশী (৬৬ লাখ বেল) হয়েছে। এবং যোগাযোগের অসুবিধাও অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। ফলে, গেলো আর্থিক বছরে যেখানে ৩২·৩০ লাখ বেল কাঁচাপাট বাজারে এসেছিলো, সেখানে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট ৬১·৯২ লাখ বেল কাঁচাপাট বাজারে এসেছে। কিন্তু ১৯৭১-৭২ সালে যেস্থলে ২১·৫ লাখ বেল কাঁচাপাট পরবর্তী বছরের হিসাবে যোগ হয়েছিলো, সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে মাত্র ১২·৬ লাখ বেল কাঁচাপাটের জের টানতে হবে।

১৯৭২-৭৩ সালে কাঁচাপাট ও মেশতার রেজিষ্ট্রীকৃত রপ্তানী বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬·৬২ লাখ বেলে। ১৯৭১-৭২ সালে এর পরিমাণ ছিলো ৩৩·৬৭ লাখ বেল।

কিন্তু ১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত কাঁচাপাট ও মেশতার সত্যিকার রপ্তানী প্রেরণ দাঁড়িয়েছে ২৮·২৬ লাখ বেলে (মূল্য ১০৪·৭০ কোটি টাকা)। এর ঠিক আগের বছর অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালে রপ্তানী প্রেরণ ছিলো মাত্র ১৯·৭০ লাখ বেল কাঁচা পাট। কাজেই দেখা যায় ১৯৭২-৭৩ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত রপ্তানী বিক্রির চেয়ে সত্যিকার রপ্তানী প্রেরণ ১·৬৪ লাখ বেল বেশী হয়েছে। এর কারণ আগের বছরের রেজিষ্ট্রীকরা কিছু পাট ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানী হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের ১৩·৯৭ লাখ বেল পরিমাণের অরপ্তানীকৃত কাঁচা পাট ১৯৭২-৭৩ সালে যোগ হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৭২-৭৩ সালে সত্যিকার রপ্তানী প্রেরণ আরো বেশী হতে পারতো। কিন্তু আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা অসুবিধার সৃষ্টি করে।

চা ঃ

চা শিল্প মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১৯৭১-৭২ সালে সর্বমোট ২·৬৪৭ কোটি পাউণ্ড চা উৎপাদিত হয়। ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে চায়ের উৎপাদন বেড়ে মোট ৫·৩ কোটি পাউণ্ড চা উৎপাদিত হয়েছে। কারণ, ইতিমধ্যেই চা-শিল্প কিছুটা অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের গড় বাৎসরিক উৎপাদন ৬·৫ কোটি পাউণ্ডের তুলনায় এখনো চায়ের উৎপাদন কম আছে।

চা উৎপাদন আবার ১৯৭৩-৭৪ সালের [ চা বছর ] প্রথম তিন মাসে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়ে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। গেলো চা বৎসরে যেখানে এই সময়ে উৎপাদিত হয়েছিলো ১·১১৯ কোটি পাউণ্ড চা, সেখানে চলতি চা বছরের এই তিন মাসে উৎপাদিত হয়েছে মাত্র ·৭৩৮ কোটি পাউণ্ড চা।

১৯৭২-৭৩ চা মওসুমের প্রথম আভ্যন্তরীণ নিলাম বিক্রি শুরু হয় ১৯৭২ সালের ৮ই জুনে। সেই বাজারে চায়ের দাম পাউণ্ড প্রতি সর্বনিম্ন ·৫০ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ২·৭৫ টাকার মধ্যে ছিলো। প্লেইন বিওপি চায়ের মূল্য ছিলো পাউণ্ড প্রতি ১·৪০ টাকা থেকে ১·৭০ টাকা। প্লেইন ফ্যানিংস চায়ের মূল্য ছিলো ·৫০ টাকা থেকে ·৭৫ টাকা। এবং সিটিসি-ওএফ চায়ের মূল্য ছিলো পাউণ্ড প্রতি ২·৫০ টাকা থেকে ২·৭৫ টাকা। ১৯৭১-৭২ সালের অবিক্রীত চায়ের মূল্য গুণের অবনতিতে ক্রমেই কমতে থাকে। এবং তখন প্লেইন ফ্যানিংস বিক্রি হয় পাউণ্ড প্রতি ·২০ টাকায়। বিওপি-এর মূল্য নেমে আসে পাউণ্ড প্রতি ·৪০ টাকায়। সর্বনিম্ন মূল্যের উদ্ধৃতি হয় ১৯৭২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বরের ৮ম নিলাম বিক্রির সময়। ১৯৭২-৭৩ চা মওসুমের চায়ের নিলাম বিক্রি শুরু হয় ১৯৭২ সালের ২রা আগষ্ট। তখন এক পাউণ্ড বিওপি চায়ের মূল্য ছিলো ১·৬০ টাকা থেকে ২·০০ টাকা। সিটিসি-ওএফ এক পাউণ্ড চায়ের মূল্য ছিলো ১·৯০ টাকা থেকে ২·৫০ টাকা। ১৯৭২-৭৩ সালে চায়ের মূল্য এইভাবে একটা সীমার মধ্যে থেকে গুণানুসারে উঠা-নামা করে।

১৯৭২-৭৩ সালে সর্বমোট ৪·১৮ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করা হয়েছে। এই রপ্তানীতে ১৯৭১ সালে চীন ও সিংহল থেকে যে ·৩৭ কোটি পাউণ্ড চা আমদানী করা হয়েছিলো তা যোগ করা আছে। চা রপ্তানী থেকে মোট ৬·৭৬ কোটি টাকা আয় হয়েছে। অথচ ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ ছিলো ৬·১০৩ কোটি পাউণ্ড। ১৯৭৩-৭৪ চা মওসুমের প্রথম তিন মাসে (১৯৭৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৩ সালের জুন পর্যন্ত) সর্বমোট ১·০৩ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করে রপ্তানী আয় হয়েছে ১·৭৮ কোটি টাকা। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত চা রপ্তানী করে মোট রপ্তানী আয় হয়েছে ৮·৫৪ কোটি টাকা। আর এই সময়ে চা রপ্তানী হয়েছে সর্বমোট ৫·২১ কোটি পাউণ্ড চা।

**পশুচর্ম ও চামড়া ঃ**

কিছু অস্থিরতাসহ ১৯৭২-৭৩ সালে পশুচর্ম ও চামড়ার মূল্য দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী ছিলো। ১৯৭২ সালের ২৫শে জুলাই-এ যেখানে প্রতি একশোটি লবণাক্ত ভারী ভেজা গাভীর চামড়ার বাজার মূল্য ১৪০০ টাকা থেকে ১৮০০ টাকা ছিলো, সেখানে ১৯৭৩ সালের ২রা এপ্রিলে এর মূল্য দাঁড়ায় ৫,৫০০ টাকা থেকে ৬,০০০ টাকায়। পরে ৩০শে এপ্রিলের দিকে অবশ্য একই সংখ্যক চামড়ার মূল্য কিছুটা নেমে ৪,৫০০ টাকায় আসে। কিন্তু ১৯৭৩ সালের ৩১শে মে মাসেই আবার মূল্য বেড়ে হয় ৪,৭০০ টাকা। এরপর থেকে মূল্য পড়তে থাকে। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রতি একশোটি চামড়ার

মূল্য হয় ৪,০৫০ টাকা। ছাগলের চামড়ার দামও ৮৫০ টাকা থেকে ১,১০০ টাকার এবং আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে ১৯৭২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রতি একশোটি লবণাক্ত ভেজা চামড়ার মূল্য হয় ১,৬০০ টাকা থেকে ২,২০০ টাকা। অক্টোবর মাসে দাম একটু কমলো। কিন্তু নভেম্বরেই আবার একই জিনিসের মূল্য বেড়ে গেল ১,৮০০ টাকা থেকে ২,৩০০ টাকা। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিলো। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত মূল্য ১,৭০০ টাকা থেকে ২,৪০০ ও ২,২০০ টাকা থেকে ২,৬০০ টাকায় আবার উঠা-নামা করে।

জুন মাসে আবার দাম কমে এবং ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে এসে মূল্য দাঁড়ায় ১,৬০০ টাকা থেকে ২,২০০ টাকায়। ভেড়ার চামড়ার মূল্যও বেশ উঠা-নামা ক'রেছে। ২০০ টাকা থেকে ২২৫ টাকায় প্রতি একশোটি লবণে ভেজানো চামড়া বিক্রি হয়ে ১৯৭৩ সালের ৩রা মে তারিখে এর মূল্য বেড়ে হয় ৯০০ টাকা থেকে ৯৫০ টাকা। পরবর্তী সময়ে মূল্য উঠা-নামা করে। এবং বছরের শেষে ৭৫০ টাকা থেকে ৮০০ টাকায় বাজার লাভ করে।

কাঁচা পশুচর্ম ও চামড়া রপ্তানী করে ১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ·২৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে। কিন্তু পাকা চামড়া রপ্তানী করে অবশ্য একই সময়ে লাভ হয়েছে ১০·০২ কোটি টাকা।

## ৪। শিল্প উৎপাদন

১৯৬৯-৭০ স্বাভাবিক বছরের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে শিল্পখাতে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিলো। ১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৪·৪৬ লাখ টন পাটজাতদ্রব্য উৎপাদিত হয়। আর ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত এই ছয়মাসে উৎপাদিত হয় মাত্র ১·৮৬ লাখ টন। ১৯৬৯-৭০ সালে যেখানে উৎপাদিত হয়েছিলো ৫৮৭ লাখ টন, সেখানে এই উৎপাদন অনেক কম। উৎপাদন প্রধানতঃ বিদ্যুতের অভাব ও শ্রমজনিত সমস্যায় বিঘ্নিত হয়। বারো মাসের শেষে ১৯৭৩ সালের জুনে নিউজপ্রিন্ট ও কাগজ উৎপাদিত হয়েছে সর্বমোট যথাক্রমে ০·২৮ লাখ টন ও ০·২১ লাখ টন। ১৯৬৯-৭০ সালে নিউজপ্রিন্ট ও কাগজ উৎপাদিত হয়েছিলো যথাক্রমে ০·৩৬ লাখ টন ও ০·৪৪ লাখ টন। আর উৎপাদন অবশ্য ১৯৬৯-৭০-এর তুলনায় বেশ অনেকটা বেড়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে যেখানে উৎপাদিত হয়েছিলো ০·৯৪ লাখ টন, সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদিত হয়েছে ২·১১ লাখ টন। ১৯৬৯-৭০-এর তুলনায় সুতী কাপড়ের উৎপাদন ১৯৭২-৭৩ সালে কিছুটা কম ছিলো। ১৯৬৯-৭০-এ মোট ৫৯·২২ লাখ গজ সুতী কাপড় তৈরী হয়েছিলো।

১৯৭২-৭৩ সালে তৈরী হয়েছে মোট ৫৮'৮০ লাখ গজ। কিন্তু সুতা উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিলো। ১৯৭২-৭৩ সালে মোট ৮'২০৭ কোটি পাউণ্ড সুতা উৎপাদিত হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে উৎপাদিত হয়েছিলো ১০'৫৪৫ কোটি পাউণ্ড। ম্যাচের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যায়। ১৯৭২-৭৩ সালে মোট ৫৮'৯৮ লাখ গ্রোস বাক্স ম্যাচ উৎপাদিত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক বছর ১৯৬৯-৭০ সালে মোট ম্যাচ উৎপাদিত হয়েছিলো ১২৯'৬৪ লাখ গ্রোস বাক্স।

'চট্টগ্রাম ষ্টিল মিলের' ষ্টিল উৎপাদনও ১৯৬৯-৭০-এর তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে অনেক কম হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে '৬৯ টন ষ্টিল উৎপাদিত হয়, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে উৎপাদিত হয়েছিলো ২'২০ লাখ টন ষ্টিল। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী-জুন সময়ের মধ্যে সিগারেট উৎপাদিত হয়েছে ৫৪,৮৮৯ লাখ কাঠি। পক্ষান্তরে ১৯৬৯-৭০ সালে উৎপাদিত হয়েছিলো ১,৭৭,২৯০ কাঠি সিগারেট।

## ৫। দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি ও জীবন ধারণের ব্যয়

১৯৭২-৭৩ সালে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছিলো। আভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদন ও আমদানীকৃত খাদ্যশস্য উভয়ের পরিমাণই খুব কম ছিলো। ফলে, সারা বছর জুড়ে খাদ্যশস্যের মূল্য আকাশচুম্বী ছিলো। এ ছাড়া কিছু কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেমন—কেরোসিন তেল, সরিষার তেল, বনস্পতি তেল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মাছ, চিনি, কাপড় এবং অন্যান্য যেমন—নির্মাণসামগ্রীর মূল্যও ছিলো মাত্রার বাইরে।

১৯৭২-৭৩ সালে ঢাকাস্থ সরকারী কর্মচারীদের জীবনধারণের খরচের সূচিকা* (১৯৫৫-৫৬=১০০) অসম্ভবরূপে বেড়ে যায়। কিন্তু সূচিকাতেও ভালো চিত্র পাওয়া যায় না। কারণ, এর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা খুবই সীমিত। ১৯৭২ সালের জুনে মাসিক গড় সূচিকা ৬'৮৬ টাকা বেড়ে হয় ২৫১'৬৬ টাকা। কিন্তু ১৯৭৩ সালের মে মাসে এই সূচিকা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে ৩৬৩'৭২ টাকায় পেঁৗছে। জুন মাসে অবশ্য গড় খরচ সূচিকা একটু কমে ৩৬১'৪৬ টাকায় নামে। জুনের হিসাবে এর আগের বছরের তুলনায় খরচের অংক ১৯৭২-৭৩ সালে শতকরা ৪৩'৬৩ ভাগ বাড়ে।

খাদ্যের মূল্য ১৯৭২-৭৩ সাল জুড়েই বাড়ে। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে যার মূল্য ছিলো ২৬১'৯২, ১৯৭৩ সালের মে মাসে এর মূল্য হয় ৩৭৫'১৯।

*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক হিসেব করা।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে অবশ্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কিছুটা কমে ৩৭৩'৭৩-এ নামে। তবু ঠিক আগের বছরের এই সময়ের তুলনায় জুন মাসে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ৪২'৬৯ ভাগ বেশী ছিলো। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে জ্বালানি দ্রব্যের মূল্য ২৮০'৬৭, সেখানে ১৯৭৩ সালের জুন মাসে এই অংক বেড়ে হয় ৪৩৩'০৯। আগের বছরের তুলনায় এই বৃদ্ধি শতকরা ৫৪'৩১ ভাগ। কাপড় ও জুতার খরচের সূচিকা, ১৯৭৩ সালের জুনমাসে পূর্ববর্তী বছরের এই সময়ের তুলনায় শতকরা ৯১ ভাগ ও অন্যান্য জিনিসের খরচ শতকরা ৩৩'৫৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# অর্থ

# ও

# ঋণ

## ১। অর্থ সরবরাহ

বছরান্তে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন মোট অর্থসরবরাহের পরিমাণ ছিলো, ৬৯৬·৩৩ কোটি টাকা। ১৯৭২-৭৩ সালে অর্থসরবরাহ বেড়েছে ২১০·৩৩ কোটি টাকা। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়েও অর্থসরবরাহের পরিমাণ বেড়েছিলো। কিন্তু সেই সময়ে অর্থসরবরাহ বেড়েছিলো মাত্র ৯৮·২০ কোটি টাকা। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাজারে অর্থসরবরাহ বেড়েছে মোট ৩০৮·৫৩ কোটি টাকা। বর্ধিত অর্থসরবরাহের ফলে ১৯৭২-৭৩ সালে বাজারে টাকার পরিমাণ ১১০·৮৩ কোটি টাকা বেড়ে ২৮৬·৪৩ কোটি টাকা হয়। একই কারণে ব্যাংকে তলবী আমানতের অংকও ৯৯·৫০ কোটি টাকা বেড়ে ৪০৯·৬০ কোটি টাকা হয়। অপরপক্ষে ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে ১২৯·২০ কোটি টাকা বেড়ে মোট তলবী আমানতের পরিমাণ হয় ৩১০·১০ কোটি টাকা। এবং একই সময়ে বাজারে চালু টাকার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে ৩১ কোটি টাকা কমে ১৭৫·৬০ কোটি টাকা হয়।

১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ বর্ধিত অর্থসরবরাহের কারণ প্রধানতঃ দুটো। প্রথমতঃ, সরকার ব্যাংক থেকে প্রচুর টাকা ঋণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোও প্রচুর টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত খাতে ঋণ সরবরাহ অনেকটা কমেছে। বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়ার জন্যেও অর্থসরবরাহ প্রভাবিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে রাজস্ব আয় তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সরকারও তার সাহায্য, পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও উন্নয়নের কাজের জন্যে ব্যাংক থেকে প্রচুর অর্থ ঋণ করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে কি কি কারণে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অর্থসরবরাহ বেড়েছে তা নীচের টেবিলে দেখানো হোল :

(সম্প্রসারণ +)
(সংকোচন −)

**অর্থসরবরাহ বৃদ্ধির কারণ সমূহ**

(কোটি টাকার হিসাবে)

| | | ডিসেম্বর ১৯৭১ | জুন ১৯৭৩ | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| ১। | বাজারে চালু মুদ্রা | ২০৬·৬০ | ২৮৬·৪৩ | +৭৯·৮৩ |
| ২। | তলবী আমানত | ১৮০·৯০ | ৪০৯·৬০ | +২২৮·৭০ |
| | অর্থ সরবরাহে পরিবর্তন : | | | +৩০৮·৫৩ |

**কারণসমূহ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ক) আভ্যন্তরীণ ঋণ সম্প্রসারণ | | +৫২·০০ |
| ১। | ব্যক্তিগত খাত | −১৩·৪৪ | |
| ২। | রাষ্ট্রায়ত্ত খাত | +২০০·০০ | |
| ৩। | তপশীলী ব্যাংকসমূহে দীর্ঘ মেয়াদী আমানত (আন্তঃব্যাংক হিসাব বাদে) | −১৩৪·৫৬ | |
| | খ) রাজস্বসম্বন্ধীয় সরকারী কার্যক্রম | | +১৮৩·০৮ |
| | গ) বৈদেশিক খাত | | +৬৪·১৪ |
| | ঘ) অবশিষ্টাংশ | | +৯·৩১ |
| | মোট কারন সমূহ : | | +৩০৮·৫৩ |

**অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক বিবরণ ও তার অংশ সমূহ নীচে দেয়া হোল :—**

| সময় | বাজারে চালু মুদ্রা | তলবী আমানত | অর্থ সরবরাহ |
|---|---|---|---|
| ডিসেম্বর ১৭,১৯৭১ | ২০৬·৬০ | ১৮০·৯০ | ৩৮৭·৫০ |
| জুন ৩০,১৯৭২ | ১৭০·৬০ | ৩১০·১০ | ৪৮০·৭০ |
| জুন ২৯,১৯৭৩ | ২৮৬·৪৩ | ৪০৯·৬০ | ৬৯৬·০৩ |
| ১৯৭২-৭৩ সালের পরিবর্তন | +১১৫·৮৩ | +৯৯·৫০ | +২১৫·৩৩ |
| স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৩ সালের জুন পর্যন্ত সময়ের পরিবর্তন | +৭৯·৮৩ | +২২৮·৭০ | +৩০৮·৫৩ |

## ২। ব্যাংকিং ও ঋণ পরিস্থিতি

১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৩ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ ১৮৫.৯৪ কোটি টাকা বেড়ে ৬১২.৫৫ কোটি টাকা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়ে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ মাত্র ১.৪৪ কোটি টাকা বেড়ে ৪২৬.৬১ কোটি টাকা হয়। ব্যাংক-ঋণের মধ্যে আগাম-ঋণের পরিমাণ ১৬৩.৭৪ কোটি টাকা বেড়ে ৫৫৪.৩৫ কোটি টাকা হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে ক্রীত ও বাটাকৃত বিলের পরিমাণ ২০.২০ কোটি টাকা বেড়ে ৫৮.৩০ কোটি টাকা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বিশেষ করে পাট-ব্যবসা, পাটকল ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ করার ফলেই ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাড়ে। ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৭৩ সালের জুনের মধ্যে তপশিলী ব্যাংকগুলোর আমানত (আন্তঃব্যাংক হিসাব বাদে) ১৭৯.০৭ কোটি টাকা বেড়ে ৭০২.৬৮ কোটি টাকা হয়। পক্ষান্তরে, ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে তপশিলী ব্যাংকগুলোর আমানত বেড়েছিলো মাত্র ১৮৪.১৯ কোটি টাকা। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ব্যাংকে ৩৬৩.২৬ কোটি টাকার আমানত বাড়ে। ১৯৭২-৭৩ সালে ব্যাংকের মোট আমানত বৃদ্ধির মধ্যে তলবী আমানত ৯৯.৫০ কোটি টাকা বেড়ে ৪০৯.৬০ কোটি টাকা হয়। দীর্ঘ-মেয়াদী আমানত ৭৯.৫৭ কোটি টাকা বেড়ে ২৯৩.০৮ কোটি টাকা হয়। পক্ষান্তরে, ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তলবী আমানত বাড়ে ১২৯.২০ কোটি টাকা এবং দীর্ঘ-মেয়াদী আমানত বাড়ে ৫৪.৯৯ কোটি টাকা। দ্রুত গতিতে ব্যাংকে আমানত বাড়ার কারণ হিসাবে প্রথমতঃ ব্যাংকের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধিই কাজ করেছে বেশী। দ্বিতীয়তঃ, সাবধানতা অবলম্বনকল্পেও অনেকে ব্যাংকে আমানত রেখেছেন।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে ব্যাংকের দেনা পরিশোধ ক্ষমতা [Liquidity] একটু খারাপ ছিলো। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ব্যাংক-ঋণ যেখানে বেড়েছিলো মাত্র ১.৪৪ কোটি টাকা; সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ পূর্বাবস্থা থেকে ১৮৫.৯৪ কোটি টাকা বাড়ে। ফলে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আরো ৭.৭৪ কোটি টাকা ঋণ নেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৯৭২-৭৩ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক সংরক্ষিত টাকার পরিমাণও ৩৭.৩৮ কোটি টাকা কমে। অধিকন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের নগদ অর্থও ১৬.৬৫ কোটি টাকা কমে যায়।

### ৩। ব্যাংকের হার

ব্যাংকের হার শতকরা ৫ টাকা নির্ধারিত হয়। স্বাধীনতার পূর্বেও এই হার ছিলো। এর কোন পরিবর্তন হয়নি।

### ৪। সুদের হার

আমানতের উপর সুদের হার নিম্নলিখিত ভাবে নির্ধারিত হয়েছে:

| বিভিন্ন প্রকার আমানত | সুদের হার |
|---|---|
| ১ক) বিশেষ নোটিশযুক্ত হিসাব অথবা ৭-২৯ দিনের নোটিশে টাকা তোলা যায় এমন হিসাব | ৩% বছর প্রতি |
| খ) বিশেষ নোটিশযুক্ত হিসাব অথবা ৩০ অথবা এর বেশী দিনের নোটিশে টাকা তোলা যায় এমন হিসাব। | ৩½% ঐ |

| বিভিন্ন প্রকার আমানত | সুদের হার |
|---|---|
| ২ক) চেক ব্যবহারের সুযোগসহ সঞ্চয়ী হিসাব | ৪% বছরপ্রতি |
| খ) চেক ব্যবহারের সুযোগবিহীন সঞ্চয়ী হিসাব অর্থাৎ যে হিসাবে পাসবই দেয়া হয় ও স্লিপ ব্যবহারে টাকা তুলতে হয় | ৪½% ঐ |
| **৩। দীর্ঘ-মেয়াদী আমানত** | |
| ক) ৩ মাস অথবা তিন মাসের উপরে কিন্তু ৬ মাসের কম সময়ের জন্য | ৪½% ঐ |
| খ) ৬ মাস অথবা ৬ মাসের উপরে কিন্তু ১ বছরের কম সময়ের জন্যে | ৪¾% ঐ |
| গ) এক বছর অথবা একবছরের উপরে কিন্তু দুই বছরের কম সময়ের জন্যে | ৫% ঐ |
| ঘ) দুই বছর অথবা দুই বছরের উপরে কিন্তু তিন বছরের কম সময়ের জন্যে | ৫½% ঐ |
| ঙ) তিন বছর অথবা তিন বছরের বেশী সময়ের জন্যে | ৬% ঐ |

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক) অবশ্য উপরে বর্ণিত সুদের হারের চেয়ে শতকরা একভাগ বেশী সুদ নির্ধারণ করতে পারে।

স্বাধীনতার পূর্বকালীন সময়ের মতো স্বাধীনতার পরেও ছোট ব্যাংকগুলো তার আগাম-ঋণের উপর সাধারণ খাতকের কাছ থেকে শতকরা দশ ভাগ সুদ আদায় করছে। আর বড়ো ব্যাংকগুলো আদায় করছে শতকরা নয় ভাগ সুদ। পাটব্যবসা ও পাটশিল্পের দ্রুত পুনর্বাসন কল্পে পাটের প্রতি আগামের উপর ৮½% ভাগের উপর সুদ ধরা হচ্ছে না।

## ৫। তলবী অর্থ বাজার

দেশের অর্থসম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্যে ঢাকায় একটি তলবী অর্থ-বাজার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বে এই ধরনের সংগঠিত কোন তলবী অর্থ-বাজার এখানে ছিলো না। তাই পুরো-পুরিভাবে একটি সংগঠিত অর্থ-বাজারের উৎপত্তি হতে একটু সময় লাগবে। তলবী অর্থ-বাজারে সুদের হার বর্তমানে শতকরা তিন ভাগ থেকে শতকরা সাড়ে সাত ভাগ।

## ৬। কৃষি ঋণ

কৃষি ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে এদেশে সবসময়েই সাধারণ শেয়ারের মুলধনাভাব ছিলো। বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের (কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিলো ৩৭·২২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৮·১৬ কোটি টাকার কৃষি-ঋণের পরিশোধের সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। অনাদায়ী ঋণের প্রায় সবটাই মওকুফ হয়ে গেছে।

এ ছাড়া কৃষি-উন্নয়ন ব্যাংকের ঢাকা কার্যালয় ছিলো একটা শাখা মাত্র। করাচীর অর্থ ছাড়া তার কোন নিজস্ব অর্থ ছিলো না। স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবেই কৃষি-ব্যাংকের পক্ষে ঋণের টাকা তুলে নিয়ে কৃষকদেরকে আবার ঋণ দেবে তা অসম্ভব ছিলো। সমবায়গুলোরও একই অবস্থা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে সমবায়গুলোর অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিলো ২১·৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৮·৪৫ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণই ছিলো দীর্ঘদিনের। ঋণের টাকা পরিশোধ খুব কমই হতো। ফলে, এই সমস্ত ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে নেয়া ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। এবং তাই তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে পুনঃঋণের সুযোগ পাওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংক এভাবে বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে ১০·২২ কোটি টাকা

পেতো। এর মধ্যে ৭'০৬ কোটি টাকাই দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী ছিলো। তাদের ঋণ-কর্মসূচীকে সহায়তা করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করে।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘদিনের অনাদায়ী ঋণকে মাঝারী মেয়াদের ঋণে রূপান্তরিত করে। এই ধরনের ঋণের পরিমাণ ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে ১১'১০ কোটি টাকা ছিলো।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক সমবায়গুলোকে যে সমস্ত সদস্য তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কারণের জন্যে ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি, তাদের ঋণ দেওয়ার অনুমতি দেয়।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক চাল উৎপাদনের জন্যে ঋণদানে উৎসাহ দান করে। সেই অনুসারে এ পর্যন্ত দেয়া ২৬'৪০ কোটি টাকার (রূপান্তরিত ঋণ বাদে) ঋণের মধ্যে ২২'৭০ কোটি টাকাই চালের উৎপাদনের জন্যে দেওয়া হয়।

(৪) চিনির উৎপাদন বাড়িয়ে বর্তমান ঘাটতি পূরণ করার জন্যে স্বাধীনতার পূর্বকালীন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী ঋণ আখ উৎপাদনের জন্যে সমবায়গুলোকে দেওয়া হয়।

(৫) মৎস্য সমবায়গুলো সবসময়েই অবহেলিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতার পরপরই মৎস্য সমবায়গুলোকে ঋণ দেওয়ার জন্যে ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই ঋণ মাঝারি মেয়াদের।

(৬) স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিপুল সংখ্যক গবাদি-পশু বিনষ্ট হয়। গবাদি-পশু পুনঃসংগ্রহের জন্যে সমবায় ও কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হয়।

(৭) স্বাধীনতার পূর্বে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দেয়া হোত না। সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক স্বাধীনতার পর ঋণের টাকা তুলতে না পারায় দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিতে অপারগ হয়। সরকারের অনুমোদনক্রমে সমবায় বন্ধকী ব্যাংকগুলোকে তাদের সদস্যদের ঋণ দেয়ার জন্যে ৫০ লাখ টাকার ঋণ বরাদ্দ করে।

উপরোক্ত উদারনীতির ফলে বাংলাদেশ ব্যাংককে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সমবায়) ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে ২৫'৬১ কোটি টাকার ঋণ বরাদ্দ করতে হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে ৩৫'৯৯ কোটি টাকা পুনঃ অর্থযোগানের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে মোট বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১'৬০ কোটি টাকা।

## ৭। চা শিল্পে অর্থযোগান

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই চা শিল্প নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৯৭১ সালে চায়ের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে। ১৯৭২ সালেও স্বাভাবিকের

তুলনায় চা উৎপাদন অনেক কম হয়। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোল চা-শিল্প এখনো পাকিস্তানের হৃত বাজারের বিকল্প সৃষ্টি করতে পারেনি। চা-শিল্পের খরচ বেড়েছে। কিন্তু আয় কমেছে। যে সমস্ত চা বাগানের উৎপাদিত চায়ের মান একটু নীচু ধরনের এরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত।

পাউণ্ড প্রতি '৫০ টাকা সাবসিডি দেয়ার পরও চা-শিল্প নিজপায়ে দাঁড়াতে পারছে না। ১৯৭৩ সালে চা শিল্পে ঋণ ব্যবস্থা করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে ৫ কোটি টাকার বিশেষ ঋণ দিয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চা-সহ বিভিন্ন ধরনের কৃষি কাজের জন্যে যে তিন কোটি টাকার ঋণ বরাদ্দ পেয়েছিলো, তা থেকে চা শিল্পেও ঋণ দিয়েছিলো।

## ৮। ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ

আলোচ্য সময়ের মধ্যে ব্যাংকগুলোর ঋন-পরিশোধ যোগ্যতা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছিল এবং তাদের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা ছাড়া আর কোন ঋণ দেয়া সম্ভব ছিলো না। সুতরাং, বাংলাদেশ ব্যাংক স্বাভাবিকভাবে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ হিসাবে ব্যবহৃত বাটার হার ও সর্বনিম্ন সংরক্ষণ চাহিদার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এক সাথে কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্যে ফটকাবাজারী কার্যাবলী রোধ করা ও অনিয়মিত নিশ্চয়তার বিপরীতে ঋণ দেয়া বন্ধ করা। বর্তমানে ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ কার্যকরী আছে :

১) তপশিলী ব্যাংকগুলোর মোট তলবী ও দীর্ঘ-মেয়াদী দায়ের বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে শতকরা যে ৫ টাকা জমা রাখার নিয়ম ছিলো, তা অপরিবর্তিত আছে।

২) স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে ব্যাংকগুলোর দেনা—নগদ টাকার যে সম্পর্ক শতকরা ২৫ টাকায় নির্ধারিত ছিলো, এখনো তা অপরিবর্তিত রয়েছে।

৩) নিশ্চয়তা বা নিশ্চয়তাবিহীন নতুন কোন চাহিবামাত্র ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ অথবা নগদ ঋণ কোন ব্যক্তিকে দেয়া যাবে না। অবশ্য স্বর্ণ অথবা স্বর্ণালঙ্কারের বিপরীতে দেয়া যাবে। কোন ব্যক্তিকে ব্যবসা অথবা ঘর-বাড়ী মেরামতের জন্য ঋণ দিতে হলে তার জমি-জমা বন্ধক রাখতে হবে। গৃহ-ঋণ হলে ব্যাংককে দেখতে হবে যে, উল্লিখিত ঋণের টাকা ঘর-বাড়ী মেরামতের জন্যে সত্যিসত্যি খরচ হবে এবং এই ঋণের টাকা যে সমস্ত বাড়ী-ঘর—২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালের পর থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ী-ঘরের মেরামতে কাজে লাগছে। অথবা পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হয়েছে,

এমন সব ঘর-বাড়ী মেরামতের জন্যে ঋণ দেয়া হবে। এর জন্যে ব্যাংকগুলোকে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা ঋণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৪) ঘর-বাড়ী নির্মাণসহ কোন অনুৎপাদক কাজেই জমি-জমার মতো প্রাথমিক নিশ্চয়তার বিপরীতে ঋণ দেয়া হবে না।

৫) ষ্টক-এক্সচেঞ্জের নিশ্চয়তাপত্র, শেয়ার, ঋণপত্র ও অন্যান্য ঋণপত্র যেমন—পাকিস্তান/পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিশ্চয়তাপত্র, জাতীয় বিনিয়োগ ট্রাষ্ট সার্টিফিকেট ইত্যাদির বিপরীতে কোন ঋণ দেয়া হবে না।

৬) সরকার, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও চিনিকল ছাড়া নিম্নলিখিত পণ্যদ্রব্যের বিপরীতে ঋণ দেয়া হবে না :

(ক) সমস্ত প্রকারের খাদ্যশস্য ও ডাল

(খ) গম ও ময়দা

(গ) তৈল বীজ

(ঘ) ভোজ্য তেল (শোধিত, অশোধিত অথবা উদজান মিশ্রিত)

(ঙ) চিনি

(চ) কেরোসিন

( বিশেষ কোন অবস্থাতে একমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক এই নিয়মের রদ-বদল করতে পারে )

৭) কোন ঋণ অথবা গ্যারান্টিযুক্ত ঋণই দেয়া যাবে না। যদি না তা রপ্তানীকে সাহায্য করে।

৮) কিস্তি ক্রয় অথবা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভাড়া ক্রয়ের কোন ব্যবসাকেই ঋণ দেয়া হবে না। অবশ্য নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমগুলো প্রযোজ্য :

(ক) আমদানীকৃত অথবা দেশীয়ভাবে উৎপাদিত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্যে, যা কৃষি অথবা শিল্পখাতে উৎপাদন বাড়াবে এই সমস্ত ক্রয়ে।

(খ) ব্যক্তিখাতের বাণিজ্যিক পরিবহণ ক্রয়ের জন্যে ঋণের বেলায়।

৯) নিষিদ্ধ আমদানীকৃত মালের বিপরীতে কোন নতুন ঋণ দেয়া যাবে না। এমন কি আগের ঋণও বাড়ানো যাবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

# ব্যাংক ব্যবসায় পুণর্বাসন

# ও

# উন্নয়ন

## ১। ব্যাংক-ব্যবসার পুনর্জীবন

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা অভূতপূর্ব দুর্যোগের মধ্যে নিপতিত হয়। সেই সময় ব্যাংকের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ টাকা আমানত-কারীরা তুলে নেয়। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানীরা প্রচুর টাকা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে ফেলে। অনেক ব্যাংক শাখা হয় লুণ্ঠিত। শাখা অফিস পোড়ানোও হয়। ব্যাংক সমূহের বেশ কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্মচারী ও অফিসারও এই সময়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক নিহত হয়। ব্যাংকসমূহ এই ধরনের লুট ও ধ্বংসযজ্ঞের ফলে কয়েক কোটি টাকার সম্পদ হারায়। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর ব্যাংকসমূহের অনেক অভিজ্ঞ কর্মচারী, অফিসার ও কার্যনির্বাহী যারা অবাঙ্গালী ছিলো, তারা কাজে উপস্থিত না হওয়ায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

সমস্ত ব্যাংক ব্যবসাকে পুনর্জীবিত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পরামর্শক্রমে কতকগুলো নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করেন। এর কতকগুলো নিম্নরূপ :

(১) শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক ও কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। কারণ, এদের প্রধান কার্যালয় ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে।

(২) তাড়াহুড়া করে যাতে ব্যাংক থেকে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ব্যাংক থেকে টাকা তোলার হিড়িক পড়ে না যায় সেজন্যে ১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত লেন-দেন বন্ধ রাখা হয়।

(৩) ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে যাতে আবার বেশ টাকা তোলার হিড়িক না পড়ে এবং যাতে ব্যাংকের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট না হয়, তার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে কতকগুলো নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। কারণ, ব্যাংকে তখন নগদ অর্থ খুব কম ছিলো। লকার্সের লেন-দেন বন্ধ রাখা হয়, যাতে লকার্স থেকে মূল্যবান সম্পদ হস্তান্তরিত না হয়। তারপর আস্তে আস্তে এসবের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

(৪) স্বাধীনতার পূর্বে টেলিগ্রামে প্রেরিত পশ্চিম পাকিস্তানী সমস্ত টাকা ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইস্যু করা ড্রাফ্টের বিপরীতে নগদ টাকা দেয়া

স্বাধীনতার পর বন্ধ রাখা হয়। ১৯৭২ সালের ১লা জুন থেকে অবশ্য বাংলাদেশের নাগরিকদের সুবিধার্থে তা তুলে নেয়া হয়।

(৫) বাংলাদেশে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকগুলোকে স্বাধীনতার পর তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ও ব্যাংকগুলোর উপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে কতগুলো জরুরী ঋণ সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হয়। যাতে যেকোন মুহূর্তে যেকোন আমানতকারী হঠাৎ টাকা তুলতে আসলে ব্যাংকগুলো আমানতকারীর জমাকৃত টাকা ফেরত দিতে অসুবিধা ভোগ না করে। একই সাথে আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখা হয়। শিল্প ও ব্যবসার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহে যাতে ঋণের অভাব না হয় সে দিকেও নজর দেয়া হয়। প্রাক্তন ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকে ব্যাংকগুলো পাকিস্তান আমলে যে ঋণ করেছিলো বাংলাদেশ ব্যাংক স্বাধীনতার পর সেই ঋণের টাকা পরিশোধের জন্যে তাগাদা দেয় নি। যাতে ব্যাংকগুলোর দায় পরিশোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৬) পাটকলগুলোকে পুরোদমে চালু করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পাটকলে তাদের স্থায়ী সম্পদের বিপরীতে আশু প্রয়োজনীয় টাকার ঋণ সরবরাহের নির্দেশ দেয়। রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পাট রপ্তানীকারকদেরকে অধিকতর ঋণ-সুবিধাদি দেয়ার জন্যেও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আদেশ করা হয়। নতুন বিনিময় হারের হিসাবে রপ্তানী-কারকদের বন্দরস্থ মওজুদ মাল যা জাহাজে উঠার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তাকে ঋণের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করার পরামর্শ দেয়া হয়।

(৭) ব্যাংকে আমানত বাড়ানো ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে অহেতুক প্রতিযোগিতা রোধ করার জন্যে সুদের হারগুলো নতুন করে সাজানো হয়।

(৮) অর্থনীতির পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বাভাবিকীকরণের উদ্দেশ্যে ছোট ব্যবসায়ীদের যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদেরকে তাদের সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ দেওয়ার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বলা হয়। ব্যাংকগুলোকে ব্যক্তি প্রতি সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা ঋণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

## ২। ব্যাংক জাতীয়করণ ও নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতার পর পর আমরা দেশের তপশিলী ব্যাংকগুলোকে নিম্নবর্ণিতভাবে শ্রেণীভুক্ত পাই :

| শ্রেণী বিভাগ | ব্যাংকের সংখ্যা | মোট শাখা |
|---|---|---|
| (ক) ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলপমান্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান ও এগ্রিকালচারেল ডেভেলপমান্ট ব্যাংক অব পাকিস্তানসহ পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংক | ১২ | ১,০০০ |
| (খ) বাঙালীদের ব্যাংক | ২ | ১৫৫ |
| (গ) বিনিময় ব্যাংক (পাকিস্তানী ব্যাংক ভিন্ন বিদেশী ব্যাংক) | ৩ | ১৪ |
| (ঘ) সরকারী তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক পরিচালিত ভারতীয় ব্যাংক | ৫ | ২২ |
| মোট | ২২ | ১,১৯১ |

প্রশাসক দ্বারা চালিত পাকিস্তানী ব্যাংকের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কিছুদিনের মধ্যেই অপ্রতুল হয়ে উঠলো। কতগুলো সমস্যার সৃষ্টি হোল—যেখানে সরকারকে অবিলম্বে নজর দিতে হয়। ঋণ ও দায় পরিশোধের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, দায় ও সম্পদের সম্পর্কহীনতাসহ সমস্যা দেখা দেয় ব্যাংকের আইনগত অবস্থা নিয়ে। যার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দেয়। এ ছাড়াও সমস্যা ছিলো অনেক। পশ্চিম পাকিস্তানীদের ব্যাংকগুলোতে আমানতী টাকা ছিলো সব বাঙালীদের। কিন্তু ব্যাংকের মালিকরা সেই টাকায় ঋণ দিয়েছে পাকিস্তানীদেরই শিল্প ও কলকারখানায়। এই সমস্ত কারণে, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় আদর্শের বাস্তবায়নকল্পে ও প্রাপ্য সম্পদের সুষম বণ্টনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। সরকার "বাংলাদেশ ব্যাংকসমূহ (জাতীয়করণ) আদেশ ১৯৭২" জারী করেন। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ থেকে বিদেশী ব্যাংক ও উন্নয়ন ব্যাংক (যা আগে থেকেই সরকারী

মালিকানাধীন ) ব্যতীত সমস্ত ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। তাদের নতুন নাম ও মূলধনের হিসাব নীচে দেওয়া হোল :

| প্রাক্তন ব্যাংক | নতুন ব্যাংক | অনুমোদিত মূলধন | পরিশোধিত মূলধন |
|---|---|---|---|
| | | লক্ষ টাকা | লক্ষ টাকা |
| ক) দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান<br>খ) দি ব্যাংক অব বাওয়ালপুর লিঃ<br>গ) দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ | সোনালী ব্যাংক | ৫০০ | ২০০ |
| ক) হাবিব ব্যাংক লিঃ<br>খ) কমার্স ব্যাংক লিঃ | অগ্রণী ব্যাংক | ৫০০ | ১০০ |
| ক) ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ<br>খ) ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ | জনতা ব্যাংক | ৫০০ | ১৫০ |
| ক) মুসলিম কমার্শিয়েল ব্যাংক লিঃ<br>খ) অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লিঃ<br>গ) ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংক লিঃ | রূপালী ব্যাংক | ৫০০ | ১০০ |
| ক) ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ | পুবালী ব্যাংক | ৫০০ | ১০০ |
| খ) ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন | উত্তরা ব্যাংক | ৫০০ | ১০০ |

সরকার কর্তৃক প্রত্যেক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা বোর্ড তৈরী সাপেক্ষে বর্তমানে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক একজন ব্যবস্থাপক-পরিচালক দ্বারা চালিত হচ্ছে। তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। ব্যবস্থাপনা-বোর্ডের সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে দেয়া আছে। বোর্ডের সমস্ত কাজ তিনিই করেন।

'বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আদেশ ১৯৭২' ( প্রেসিডেন্টের অর্ডিন্যান্স নং ১২৯, ১৯৭২ ) দ্বারা বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইক্যুয়িটি অংশগ্রহণ ফাণ্ড ও সাবেক ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলাপমান্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান নামক দুটো সংস্থা ভেঙ্গে এই নতন ব্যাংক সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঋণ ও পুঁজি সংস্থান করাই এর উদ্দেশ্য।

একইভাবে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ ১৯৭৩' ( প্রেসিডেন্টের অর্ডিন্যান্স নং ২৭, ১৯৭৩ ) নামীয় আদেশ বলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সৃষ্টি করা হয়েছে।

সাবেক এগ্রিকালচারেল ডেভেলাপম্যান্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়েই এই নতুন ব্যাংকের উৎপত্তি। কৃষক ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে ঋণ দেয়াই এর উদ্দেশ্য।

## ৩। ব্যাংক ব্যবসার অগ্রগতি

নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবসার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের নীতি একটা সুষ্ঠু ব্যাংক-ব্যবসা পদ্ধতি সৃষ্টির সহায়ক। তাই ব্যাংকগুলোকে গাঁয়ের দিকে, অনুন্নত অঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে বাস্তবসম্মত সুযোগ-সুবিধা যোগান দেয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য (১) অব্যবহৃত সম্পদ সংগ্রহ করা (২) ছোটশিল্প, ব্যবসা ও কৃষি খাতে ঋণ সরবরাহ করা (৩) গ্রামের সরকারী সমবায় সংস্থাগুলোর আর্থিক প্রয়োজন মেটানো। বলাবাহুল্য এর উদ্দেশ্য সারা দেশের সুষম উন্নয়ন ও অগ্রগতি। প্রত্যেক থানাতে একটা করে ব্যাংকের শাখা কার্যালয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা চলছে।

১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে ব্যাংকের মোট শাখা কার্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ১,১৯১। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে এর সংখ্যা হয়েছে ১,২৯৫টি (এতে কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ও ভারতীয় ব্যাংকের শাখাসমূহেরও হিসাব আছে।)। অন্যভাবে বললে বলা যায়—স্বাধীনতার পর মোট ১০৪টি শাখা বেশী খোলা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চারটি শাখা বিদেশেও স্থাপন করা হয়েছে। নীচে তাদের নাম দেওয়া হোল :

P-3669

| ব্যাংকের নাম | জায়গা |
|---|---|
| ক) পূবালী ব্যাংক | লণ্ডন |
| খ) পূবালী ব্যাংক | বার্মিংহাম |
| গ) উত্তরা ব্যাংক | লণ্ডন |
| ঘ) জনতা ব্যাংক | লণ্ডন |

বর্তমানে বাংলাদেশে দুটো বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন—বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং বিদেশী ব্যাংকসহ মোট ১৬টি তপশিলী ব্যাংক আছে।

নীচে তাদের হিসাব দেয়া গেলো :

| | | |
|---|---|---|
| ১। | রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক | |
| | ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক | ৬ |
| | খ) বিশেষায়িত ব্যাংক | ২ |
| ২। | ভারতীয় ব্যাংক ছাড়া বিদেশী ব্যাংক | ৩ |
| ৩। | সহকারী তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক পরিচালিত ভারতীয় ব্যাংক (কার্যরত নয়) | ৫ |
| | | ১৬ |

## ৪। ব্যাংক পরিদর্শন

### ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক

স্বাধীনতার পর ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তখন দ্রুত আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস কাজে হাত দিতে হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকসমূহের হিসাব আবার নতুন করে তৈরী করতে হয়। ফলে ব্যাংক-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ স্বাধীনতার পর পর ঠিক নিয়মিত পরিদর্শন কাজ শুরু করতে পারেনি। তবু ১৯৭২ সালে কিছু কিছু ব্যাংক-শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের অক্টোবর থেকে নিয়মিত পরিদর্শন কাজ শুরু হয়েছে। দুটো ব্যাংকের কার্যাবলী মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

### খ) সমবায় ব্যাংক

১৯৭২ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে কৃষি-ঋণ বিভাগ আটটি সমবায় ব্যাংক পরিদর্শন করেছে। ১৯৭২-৭৩ সালে ৫টি ( ৪টি সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক ও একটি সমবায় ব্যাংক ) ব্যাংক পরিদর্শন করা হয়েছে।

কৃষি-ঋণ বিভাগ কৃষি ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকগুলো কর্তৃক কৃষি-ঋণের কার্যক্রমের পরীক্ষার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। এতে ঋণ-গ্রহীতারা যে ঋণের প্রচুর অপব্যবহার করেছে ও অন্যখাতে খাটিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়াস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি-ঋণ বিভাগের সেলগুলো আভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের উপর অর্থনৈতিক সমীক্ষা করেন। এতে দেখা যায়—এই খাতে বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, মৎস্য শুষ্ককরণ ও পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

# জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থা
# ও
# রাজস্ব সম্বন্ধীয় নীতি

## ১। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের বাংলাদেশ বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয় ৪৮·৫২ কোটি টাকা আর রাজস্ব ব্যয় ধরা হয় ৯৯·১৩ কোটি টাকা। এতে রাজস্ব খাতে ঘাটতি থাকে ৫০·৬১ কোটি টাকা। এছাড়া একই সময়ের উন্নয়ন-বহির্ভূত মূলধনের হিসাবেও নীট ১০·৭৬ কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয়। তাই সবমোট ঘাটতি দাঁড়ায় ৬১·৩৭ কোটি টাকা। মোট রাজস্ব আয় ৪৮·৫২ কোটি টাকার মধ্যে আবগারী করের পরিমাণই ছিলো ২৪·৯১ কোটি টাকা। ১০·০৯ কোটি টাকা আয়কর, কর্পোরেশন কর ও বিক্রয় কর থেকে আসার কথা। আমদানী করের পরিমাণ ছিলো ৬·৩৫ কোটি টাকা। খরচের হিসাবে প্রশাসন ও শিক্ষা খাতে যথাক্রমে ৩৩·৫৫ ও ২৩·৫৫ কোটি টাকা ধরা হয়। দেশরক্ষা খাত ও রাজস্ব বিভাগের খরচ ধরা হয় যথাক্রমে ১৩·৬৫ ও ৬·৭২ কোটি টাকা।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের বাজেটে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন খাতেই মূলধনী বাজেটের সিংহভাগ খরচ হিসাবে দেখানো হয়। এই খাতে বরাদ্দ হয় ১০৭·৩১ কোটি টাকা। এই টাকার মধ্যে ৩৪·৪০ কোটি টাকা রাখা হয় টেষ্ট রিলিফ ও ওয়ার্কস প্রোগ্রামের জন্যে এবং ৫১·৪৬ কোটি টাকা রাখা হয় খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য। মোট হিসাবে উন্নয়ন, রিলিফ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন খাতে খরচ ধরা হয় ১৫৮·৭৭ কোটি টাকা। রাজস্ব বাজেটের ৬১·৩৭ কোটি টাকা ঘাটতিসহ তাই বাজেটে মোট ২২০·১৪ কোটি টাকার প্রয়োজন দেখানো হয়। এর মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় ১১৩ কোটি টাকা। বাকী ১০৭·১৪ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারকে ধার দেয়।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে উন্নয়ন খাতে ৫০১.০০ কোটি টাকা ও রাজস্ব খাতে ২৮৫·৩৮ কোটি টাকার হিসাব করা হয়। মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৮৬·৩৮ কোটি টাকা। রাজস্বখাতের মোট আয় ২৮৫·৩৮ কোটি টাকা থেকে মোট খরচ ২১৮·৪৩ কোটি টাকা বাদ দিয়ে ৬৬·৯৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়। উন্নয়ন বাজেটে ৩১৮·৩০ কোটি টাকা থাকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্যে, আর ১৮২·৭০

কোটি টাকা ধরা হয় পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্যে। ১৯৭২-৭৩ সালের পুনর্মূল্যায়িত বাজেটে রাজস্ব আয় হিসাব করা হয় ২৪২.৫০ কোটি টাকা। রাজস্ব খরচ ধরা হয় ২২৫.২১ কোটি টাকা। তাতে মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১৭.২৯ কোটি টাকায়।

১৯৭২-৭৩ সালের রাজস্ব বাজেটে আমদানীকর হিসাবে ১২৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে হিসাব করা হয়। আবগারী কর ধরা হয় ৬৫.২০ কোটি টাকা। আয়কর, বিক্রয়কর ও কর্পোরেশন কর থেকে ধরা হয় ৫২.২৬ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে আয় হিসাবে ধরা হয় ১৫ কোটি টাকা।

খরচের খাতে প্রশাসনের জন্যে ৬৮.৯৮ কোটি ও রাজস্ববিভাগের খরচের জন্যে ১৩.৯৭ কোটি টাকা ধরা হয়। দেশরক্ষা খাত পায় ৪০ কোটি টাকার বরাদ্দ। শিক্ষা খাত ৪৩.৭২ কোটি টাকা। অন্যান্য যেমন, স্বাস্থ্য খাত (১১.৯৬ কোটি), পূর্তখাত (৮.৪২ কোটি), অন্যান্য উন্নয়ন বহির্ভূত ১৪.৪৮ কোটি টাকা খরচ হিসাবে পায়। ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে বিবিধ খরচ হিসাবেও ১২ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়।

সর্বাধিক কম সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৩১৮.৩২ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটে কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাই কৃষি খাতে ১০৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কৃষি খাতের কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য দিক হোল এই যে, ১৯৭২-৭৩ সালে উচ্চ-ফলনশীল ধানজমির পরিমাণ ১৫ লক্ষ একর থেকে বাড়িয়ে ৩৬ লক্ষ একর করা হয়। এই কর্মসূচীর বাস্তবায়নকল্পে ৪.২৫ লাখ টন সার, ১২.০০০ টন কীট-নাশক ঔষধ, ৩৫,০০০টি কম ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প, ২,৪০০টি গভীর নলকূপ ও ৪,০০০টি অগভীর নলকূপ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়।

যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে ১৯৭২-৭৩ সালে ৪২.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ করা হয় ৩৫.৪০ কোটি টাকা। জল ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে বরাদ্দ করা হয় ২৬.৩৮ কোটি টাকা। গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে রাখা হয় ৩৩ কোটি টাকা। শিক্ষাখাতে ২০.০১ কোটি টাকা। বাজেটে শিল্পখাতের জন্যে ৩০.০২ কোটি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে রাখা হয় ১২.০০ কোটি টাকা। গৃহনির্মাণ খাতে খরচ ধরা হয় ১৫.১০ কোটি টাকা।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে ১৮২.৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন খাতে। এর মধ্যে ৬৬ কোটি টাকা সাহায্য ও পুনর্বাসন

খাতে এবং ১১৬·৬৮ কোটি টাকা পুনর্গঠন খাতে। পুনর্গঠন খাতে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ৫১·৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের খরচাবলীসহ বাজেটে উন্নয়ন, সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন বাবদ মোট ৫০১·০০ কোটি টাকার বরাদ্দ আছে। এছাড়া ১৬·২১ কোটি টাকা উন্নয়ন বহির্ভুত মূলধনী খরচের জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এতে কিছু লগ্নির টাকাও আছে। এই টাকাসহ মোট বাজেট হয় ৫১৭·২১ কোটি টাকার। এর মধ্যে ৩৭৫ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য, অনুদান থেকে আসবে। বাকী টাকা রাজস্ব খাতের উদ্বৃত্ত, আভ্যন্তরীণ ঋণ ও দেশীয় অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়:

১) ৬০ কাউন্টের নীচের সুতার উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ৬৫ ভাগ থেকে শতকরা ৩০ ভাগে কমিয়ে আনা হয়। ৬০ কাউন্টের উপরের সুতার জন্যে শতকরা ৬৫ ভাগ থেকে শতকরা ৪০ ভাগে আমদানী শুল্ক ধরার প্রস্তাব করা হয়। কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ১২৫ ভাগ থেকে ১০০ ভাগে নামিয়ে আনা হয়।

২) মূল্যানুযায়ী ঢেউ টিনের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ১২ ভাগ থেকে শতকরা ১০ ভাগে কমিয়ে আনা হয়। বিলেটের উপর শতকরা ৫০ থেকে কমিয়ে শতকরা ৩০ ভাগ কর ধার্য করা হয়। রংয়ের উপর শতকরা ৫০ ভাগ থেকে শতকরা ৩৫ ভাগে কমানো হয়।

৩) নারিকেল তেলের উপর শতকরা ৬২½ ভাগ করের বদলে শতকরা ৬০ ভাগ আমদানী কর বসানো হয়।

৪) কম ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পের উপর আমদানী কর ধার্য করা হয় শতকরা ১৫ ভাগ। আগে ছিলো শতকরা ৬৮ ভাগ শুল্ক। এর উপর বিক্রয়কর প্রত্যাহার করা হয়।

৫) দুই চাকার সাইকেল ও সাইকেল রিকসা ও তার খুচরা যন্ত্রাংশকে আমদানী করের হাত থেকে রেহাই দেয়া হয়।

৬) সার, কীটনাশক ঔষধ, তেল-বীজ, শিশুখাদ্য, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ ও বন্ধ্যা-নিরোধক ঔষধের উপরও আমদানী কর তুলে নেয়া হয়।

৭) কয়লা আমদানীর উপর প্রতি টনে ১০ টাকা লেভী ধার্য করা হয়।

৮) চায়ের উপর আবগারী শুল্ক পাউন্ড প্রতি ১৩ পয়সা বাড়ানো হয়। সিগারেট তৈরীর তামাকের উপর আবার পাউন্ড প্রতি এক টাকা থেকে

·৬০ টাকায় আবগারী শুল্ক নামিয়ে আনা হয়। প্রসাধনীর উপর আবগারী কর শতকরা ২৮ ভাগ থেকে শতকরা ৩৫ ভাগে উন্নীত করা হয়।

৯) পাটের কর তুলে নেয়া হয়। পাটকর মণ প্রতি ·৫০ টাকা থেকে ২ টাকায় উন্নীত হয়।

১০) ব্যক্তিগত ভাতা ১,০০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকায় উন্নীত হয়।

১১) সবার জন্যে ফাইন্যান্স কর ৫০ টাকায় ধার্য করা হয়। কিন্তু কোম্পানী অথবা মিল মালিকদেরকে আগের হারেই ফাইন্যান্স কর দিতে হবে।

১২) নব-নির্মিত আবাস বাড়ীর উপর থেকে কর প্রত্যাহার করা হয়।

## ২। রেলওয়ে বাজেট

১৯৭২-৭৩ সালের রেলওয়ে বাজেটে আয় ও ব্যয়কে সমান সমান রাখা হয়েছে। রাজস্ব খাতে আয় ধরা হয়েছে ২৪·৩৬ কোটি টাকা ও ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪·৩৫ কোটি টাকা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের রেলওয়ে বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয়েছিল ৮·৫০ কোটি টাকা। একই সময়ে রাজস্ব ব্যয় ছিলো ১১·৮৪ কোটি টাকা। এতে মোট ঘাটতি ছিলো ৩·৩৪ কোটি টাকা।

১৯৭২-৭৩ সালের রেলওয়ে বাজেটে উন্নয়ন খাতে ১৪·২১ কেটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উন্নয়ন খাতের অধিকাংশ খরচই আরম্ভ করা প্রকল্পের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ·৪৪ কোটি টাকা।

প্রকল্পগুলো হোল :

(ক) রোহনপুর—সিংগাবাদ রেলওয়ে
(খ) ঈশ্বরদী—নগরবাড়ী রেলওয়ে
(গ) ঢাকা—আরিচা রেলওয়ে
(ঘ) যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কর্মসূচী

১৯৭২-৭৩ সালে উন্নয়ন বাজেটের জন্যে বৈদেশিক মুদ্রায় সাহায্য হিসাবে ৬ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

রেলওয়ে বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, ১৯৭২-৭৩ সালে যাত্রীভাড়া অথবা মালের ভাড়া বাড়ানো হয়নি। যদিও স্বাধীনতা যুদ্ধে রেলওয়ের প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। ৬৫ মাইল রেলপথ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট অথবা খুব শোচনীয়-

ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩০০ শত পুল বিনষ্ট হয়। এর সাথে যাত্রী ও মালবাহী তিনটি ষ্টিমারসহ অধিকাংশ নদী যানবাহনই বিনষ্ট হয়। ৩৪৮টি ষ্টেশনের অধিকাংশ সিগন্যালিং ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক সিগন্যাল ও যোগাযোগ বিনষ্ট হয়। ৪১টি ডিজেল ও ২২টি বাষ্পীয় ইঞ্জিনসহ শতকরা ১০ ভাগ যাত্রীবাহী ওয়াগন ও শতকরা ৫ ভাগ মালবাহী ওয়াগন বিনষ্ট হয়।

এমতাবস্থায় রেলকর্তৃপক্ষ ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে সমগ্র রেলওয়ে ব্যবস্থাকে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা করে। যোগাযোগ মন্ত্রী বলেছেন, দু'বছরের মধ্যে ২৮·০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সমস্ত রেলওয়ে ব্যবস্থাকে পুনর্বাসিত করা হবে। ১৯৭২-৭৩ সালে ৫·৭৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৯·৯৬ কোটি টাকার রেলওয়ে পুনর্বাসন পরিকল্পনা সরকারের হাতে রয়েছে।

এই টাকা সরকারী অনুদান হিসেবে রেলওয়েকে দেয়া হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে এ কথাও ঘোষণা করা হয় যে, জাপান সরকারের সহায়-তায় অবিলম্বে যমুনা নদীর উপর রেলওয়ে ও পুল স্থাপন করা হবে। জাপানের বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তাদের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট দাখিল করেছেন।

## ৩। সরকারের ঋণ

১৯৭২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কোন ঋণ সৃষ্টি করেনি। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসেই প্রথম বারের মতো বাংলাদেশ সরকার "৫½% ঋণ-১৯৮২" সৃষ্টি করেন। এতে আশাতিরিক্ত সাড়া পাওয়া যায়। এই ঋণ দ্বারা সর্বমোট ৬৩,৭৫,০১,০০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। ১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে ত্রৈমাসিক সরকারী বিল বাজারে ছাড়া হয়। ২৫ কোটি টাকার এই সরকারী বিলের জন্যে বৎসরে শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ দেয়া হচ্ছে। এই বিল তিন মাস অন্তর অন্তর আবার বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া পাকিস্তানী নোটের বদলে বাংলাদেশের মুদ্রা প্রবর্তন করার জন্যে ২৫৫·০৬ কোটি টাকার সম্পদ সৃষ্টি করতে হয়। এই টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ফাণ্ড হিসেবে এবং সরকারের নগদ অর্থের চাহিদা পূরণের কাজেও লাগে।

সরকারকে প্রদত্ত 'ওয়েজ এণ্ড মীনস্' নামীয় আগামের পরিমান যা ৩০-৬-১৯৭২ সালে ছিলো ১৫·৯৩ কোটি টাকা তা ৩০-৬-১৯৭৩ সালে ২০ কোটি টাকা হয়েছে।

## ৪। শিল্প জাতীয়করণ

কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও এদের ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়, তদারকির উদ্দেশ্যে সংস্থা গঠনের জন্যে ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চে "বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান (জাতীয়করণ) আদেশ, ১৯৭২" ঘোষণা করা হয়।

এই আদেশ বলে নিম্নলিখিত সংস্থাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়:

১) পাট পদ্ধতিকরণ শিল্পে নিয়োজিত ৬৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ তদারকী ও সমন্বয় করার জন্যে গঠিত হয় বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা। এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৭টি হয়ে গেছে।

২) বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা :

প্রথমাবস্থায় ৬৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্রকলের দায়িত্বভার এর উপর দেয়া হয়। এই সংখ্যা ৭২-এ বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে ৬০টি চালু আছে। ১২টি কারখানাতে এখনো উৎপাদন শুরু হয়নি।

৩) বাংলাদেশ চিনিকল সংস্থার উপর বর্তায় ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের পরিচালনা।

৪) বাংলাদেশ ষ্টীলমিল সংস্থা

৫) বাংলাদেশ কাগজ ও বোর্ড সংস্থা

৬) বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও ভেষজ সংস্থা

৭) বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ সংস্থা

৮) বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস সংস্থা

৯) বাংলাদেশ খাদ্য ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্য সংস্থা

১০) বাংলাদেশ বনজসম্পদ সংস্থা

উপরের ৪নং থেকে ১০নং পর্যন্ত সংস্থাগুলোর উপর সংশ্লিষ্ট শিল্পে সরকারের প্রতিষ্ঠান ও পরিত্যক্ত শিল্পগুলো ব্যবস্থাপনার ভার দেয়া হয়েছে।

## ৫। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ

স্বাধীনতার পর পাট সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের ৩০শে মে তারিখে। এই দিন থেকেই কাঁচা পাট রপ্তানীকে জাতীয়করণ করা হয়। কাঁচা পাট রপ্তানীর জন্যে সরকার বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থার

সৃষ্টি করেন। ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই থেকে কাঁচা পাটের রপ্তানী চুক্তি কেবলমাত্র এই সংস্থাই করতে পারবে বলে ঘোষিত হয়। যারা পূর্ব থেকেই, অর্থাৎ, যে সমস্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা, কোম্পানী পাট রপ্তানী ব্যবসায় জড়িত ছিলো তারা এই ঘোষণার বাইরে থাকবেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিগত পাট রপ্তানীকারক ও পাট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সংস্থাগুলোকে বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থা রপ্তানীর কোটা নির্ধারণ করে দেয়। এবং তারা পাট রপ্তানী সংস্থার নিয়োগপত্র পেয়েই রপ্তানী কাজ সমাধা করে। কিন্তু পাট রপ্তানী চুক্তি করে পাট রপ্তানী সংস্থা।

পাট রপ্তানী সংস্থা পাট রপ্তানীর বর্তমান পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করবে। পাট রপ্তানী সংস্থার ফরমগুলোকে আর বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রেজিষ্ট্রি করাতে হবে না। কিন্তু রপ্তানী রেজিষ্ট্রেশন আগের মতোই চলতে থাকবে। যদ্দিন না এ ব্যাপারে অন্য কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

## ৬। সঞ্চয় পত্রের পুনর্বৈধকরণ

সঞ্চয়পত্র, জাতীয় প্রাইজ বণ্ড, এন.আই.টি ইউনিট, আই.সি.পি মিউচুয়েল ফাণ্ড সার্টিফিকেট ইত্যাদির মালিকদেরকে ক্ষতির হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে এই সমস্ত মালিকদের টাকা ফেরত দেয়া ও এর বদলে কি ভাবে নতুন সার্টিফিকেট, বণ্ড, ইত্যাদি দেয়া যায়, সে সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই নিয়মের অধীনে যে সমস্ত ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে ক্রীত হয়েছে ও নির্দিষ্ট নিয়মে বাংলাদেশের বিভিন্ন ডাকঘর ও ব্যাংকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেয়া হয়েছে, এদেরকে পুনর্বৈধ করা হয়েছে। তবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্যে এর উপর কোন সুদ দেয়া হবে না। এই সার্টিফিকেটের মেয়াদ হিসাবের বেলাতেও এই সময়টুকু বাদ দেওয়া হবে। এই সমস্ত সার্টিফিকেট যেগুলোকে পুনর্বৈধ করা হয়েছে, সেগুলো ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ফেরত দেয়া হচ্ছে। মালিকরা ইচ্ছা করলে এগুলো ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা নিয়ে নিতে পারে (যদি ইতিমধ্যেই ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাদ দিয়ে দু'বছর সময় পেরিয়ে গিয়ে থাকে)। অন্যান্য সঞ্চয়পত্র (যেমন এন.ডি.এস.সি ও পি.এস.সি) যেগুলো বাংলাদেশে ক্রীত

ও যাদের মালিক বাঙালী সেগুলো ২৬শে মার্চ ১৯৭১-এর পূর্বেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকলে পরিশোধ করা হচ্ছে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের পূর্বে বাঙালীদের দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানে ক্রীত যাবতীয় সঞ্চয়পত্র, ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট, এন আই টি ইউনিট, আইসিপি মিউচ্যুয়েল সার্টিফিকেট ইত্যাদি সরকার নির্ধারিত নিয়মে ও সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হবে।

২৬-৩-৭১ ও ১৫-১২-৭১ সালের মধ্যে ক্রীত কোন ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটের জন্যই সরকার কোন দায়িত্ব নেয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়

# আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক

## ১। বাণিজ্য ও পরিশোধ চুক্তি

বিপোর্টকালীন সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ বেশ কিছু সংখ্যক দেশের সাথে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করেছে।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথমদিকে বাংলাদেশ উভয়পক্ষে ১০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন দ্রব্যের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে একটি বিনিময় বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ পাট, চা ও পশুচর্ম ও চামড়া রপ্তানী করবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে আমদানী করবে যন্ত্রপাতি, লোহা, কেরোসিন ইত্যাদি।

১৯৭২ সালের মার্চে বাংলাদেশ ভারতের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি করে। চুক্তিতে উভয় পথে কিছু নির্দিষ্ট দ্রব্যের আদান-প্রদান স্বীকৃত হয়। এই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ রপ্তানী করবে মাছ, কাঁচা পাট, নিউজপ্রিন্ট, লেখার কাগজ, ফার্নেস তেল, পাটব্যাচিং তেল, নাপথা, অর্ধেক পদ্ধতিকরা গাভীর চামড়া, (ভেজা, ব্লু ও কাপকসহ), হার্ডবোর্ড ও তাঁতশিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি। আর আমদানী করা হবে তামাক, সিমেন্ট, কয়লা, তুলা, কাপড়, এ্যাশফল্ট, পাথরের বাউল্ডার, শক্ত কাঠ ও শিশুখাদ্য। কত মূল্যের কোন কোন দ্রব্য আমদানী করা হবে তা পরবর্তীকালে বিশেষ চুক্তিতে ঠিক করা হবে বলে স্বীকৃত হয়। উভয় পথে ২৫ কোটি টাকার বাণিজ্য হবে বলে স্থির হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত বাণিজ্য হবে বলেও স্থির হয়। সীমান্ত বাণিজ্যের জন্যে উভয় দেশের সীমান্ত অঞ্চলের ১০ মাইল অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়। এর জন্য উভয় দেশের কর্তৃপক্ষ পারমিট ইস্যুর মাধ্যমে বাণিজ্য করতো। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত রাখা হয়।

১৯৭৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ভারতের সাথে আর একটা চুক্তি করে। এর অধীনে ভারত বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করে আমাদের চট্টগ্রাম রিফাইনারীর জন্যে ৫ লাখ টন অপরিশোধিত তেল সরবরাহ করবে।

আর একটা চুক্তির অধীনে ভারত বাংলাদেশকে ভারতীয় মুদ্রায় ১০ কোটি টাকার ঋণ দিবে। এই টাকায় ভারত থেকে দ্রব্যাদি কেনা যাবে এবং ভারতের কোন সংগঠনের সেবামূলক কাজের পয়সা পরিশোধ করা যাবে।

এছাড়া, বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে যেমন বার্মা, হাংগেরী, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সাথেও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করে। এইসব চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই করবে।

যেসমস্ত দেশ বাংলাদেশের সাথে বিনিময় বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে তারা হচ্ছে—সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, রুমানিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ।

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সবমোট ১৩৭.৬৮ কোটি টাকার বিনিময় বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে। ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যে বিনিময় বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে মাত্র ৮১.৬৪ কোটি টাকার।

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে হাংগেরীর সাথে বাংলাদেশ সমুদ্রপথে যোগাযোগ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়ে শর্তবিহীন সাধারণ পারস্পরিক 'সব চাইতে সুবিধাভোগী দেশের ব্যবহার'—এই ভিত্তিতে একটা চুক্তি সম্পাদন করে।

## ২। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সর্বমোট ৩২০.৩৭ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ / আগামের জন্য চুক্তি করে। ১৯৭২-৭৩ সালে সর্বমোট ২৩৯.১৬ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি হয়। যেসমস্ত দেশের সাথে ঋণ চুক্তি হয়েছে, তারা হোল—সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, সুইডেন, ডেনমার্ক, রুমানিয়া, পশ্চিম জার্মানী, নেদারল্যান্ড ও বুলগেরিয়া।

## ৩। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে লেনদেন

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ৬.২৫ কোটি এস-ডি-আর ( ৫১.৬১ কোটি টাকার সমান ) 'ক্ষতিপূরণ বিষয়ক অর্থযোগান' ক্রয় করেছে (Compensatory financing purchase)। এই ক্রয়গুলোর মধ্যে আছে কানাডার ডলার (.৭২ এস-ডি-আর), জার্মান মার্ক (২.০০ কোটি এস-ডি-আর), ফরাসী ফ্রাংক (১.৩ কোটি), ইতালীয় লিরা (.৭০ কোটি এস-ডি-আর) ও জাপানী ইয়েন (১.৫ কোটি এস-ডি-আর)।

## ৪। বিনিময় হার

১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পাউণ্ড-ষ্টার্লিং-এর সাথে নতুন বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। এক পাউণ্ড = ১৮.৯৬৭৭ টাকার এই নতুন হার ৩রা জানুয়ারী থেকে

কার্যকরী হোল। বিদেশে কার্যরত বাঙালীরা যাতে বৈদেশিক মুদ্রায় দেশে টাকা পাঠাতে উৎসাহ পায়, তার জন্যে ১৯৭২ সালের ২৭শে জুলাই থেকে টাকা প্রেরণের ব্যাপারে একটি প্রিমিয়াম স্কীম তৈরী করা হয়। প্রতি পাউণ্ডের জন্যে বাংলাদেশে ৩০·০০ টাকা দেয়া হচ্ছে। অবশ্য যদি এই টাকা বাংলাদেশের আয় থেকে পাঠানো না হয়ে থাকে। এই প্রিমিয়াম স্কীম ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। পরে একে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের জন্যে কার্যকরী রাখা হয়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত হারে পাউণ্ড-ষ্টার্লিং কেনা-বেচা করেছে :

| | |
|---|---|
| তাৎক্ষণিক বিক্রয়— | ১ পাউণ্ড = ১৮·৯৮৩৩ টাকা |
| ৬ মাস পরে ডেলিভারী দেয়া হবে এমন বিক্রয়— | ১ পাউণ্ড = ১৮·৯৯৯৯ টাকা |
| তাৎক্ষণিক ক্রয় ও ৬ মাস পরে ডেলিভারী দেয়া হবে এমন ক্রয়— | ১ পাউণ্ড = ১৮·৯৬৭৭ টাকা |

অনুমোদিত ডিলারদের টেলিগ্রাফ মারফত হস্তান্তরের হার ছিলো ১৮·৯৯৯০ টাকা = ১ পাউণ্ড (বিক্রয়) এবং ১৮·৯৩৬৫ টাকা = ১ পাউণ্ড (ক্রয়)।

পরবর্তী সময়ে ২৩-৬-১৯৭২ সাল থেকে পাউণ্ড-ষ্টার্লিং-এর মূল্য ভাসমান থাকায় ২৪-৬-১৯৭২ থেকে ২৭-৬-১৯৭২ সাল পর্যন্ত লেন-দেন বন্ধ থাকে। ২৮-৬-১৯৭২ তারিখ থেকে যথারীতি পূর্ব নির্ধারিত হারে লেন-দেন আবার শুরু হয়।

পাউণ্ডের সাথে সরকারী বিনিময় হার আগের মতোই ১ পাউণ্ড = ১৮·৯৬৭৭ টাকায় রইলো।

অনুমোদিত ডিলারদের তাৎক্ষণিক হার (টেলিগ্রাফ হস্তান্তর) ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই থেকে ৫ই জুলাই, ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ছিলো ১৯·০১৩৬ টাকা = ১ পাউণ্ড (বিক্রি) এবং ১৮·৮৬৮৯ = ১ পাউণ্ড (ক্রয়)। আগাম লেন-দেন এই সময়ে স্থগিত রাখা হয়।

অনুমোদিত ডিলারদের জন্যে তাৎক্ষণিক হার (টেলিগ্রাফ হস্তান্তর) ১৯৭২ সালের ৬ই জুলাই তারিখে ১৮·৭১৪৩ টাকা (ক্রয়) এবং ১৮·৮৮৫৭ টাকায় (বিক্রয়) নির্ধারিত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ডিলারদের কাছ থেকে পাউণ্ড-ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয়ের হার নীচে (৬-৭-৭২ তারিখ থেকে) দেয়া হোল :

| | |
|---|---|
| তাৎক্ষণিক বিক্রয়— | ১ পাউণ্ড = ১৮·৮৫০১ টাকা |
| ,, ক্রয় | ১ পাউণ্ড = ১৮·৭৫০১ টাকা |
| ৩ মাস পর ডেলিভারী হবে এমন ক্রয় | ১ পাউণ্ড = ১৮·৭০৬৩ টাকা |
| ৬ মাস পর ডেলিভারী হবে এমন ক্রয় | ১ পাউণ্ড = ১৮·৬৬২৬ টাকা |

## ৫। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ

স্বাধীনতার পর প্রাক্তন ষ্টেট ব্যাংক অব্ পাকিস্তান কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ও নির্দিষ্ট সম্মতির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক বিদেশে যে টাকা পরিশোধ করতো, তা বন্ধ করে দেয়া হয়। খুব জরুরী, যেমন—বিদেশে পাঠরত বাঙালী ছাত্রদের জন্যে প্রেরিত টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় পাঠানোর সম্মতি দেয়া হয়। পরে আস্তে আস্তে স্বাধীনতার পূর্বে অনুমতিপ্রাপ্ত সমস্ত টাকা প্রেরণের ধরনকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে পরীক্ষা করা হয় এবং তাকে ধীরে ধীরে সম্মতি দেয়া হচ্ছে।

(ক) বৈদেশিক মিশনে কার্যরত সমস্ত কূটনীতিক, মিশনের অন্যান্য সদস্য, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও অন্যান্য সদস্য, যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজ করছে তাদেরকে অন-আবাসিক একটা হিসাব রাখতে হয়। এই হিসাবের নাম 'বিশেষভাবে রূপান্তরযোগ্য টাকার হিসাব'। দেশমুখী যে কোন হস্তান্তরের টাকার অংক দিয়ে এই হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। তেমনি রূপান্তরযোগ্য যে কোন মুদ্রায় বিদেশে কোন টাকা পাঠানোর অংককে এই হিসাবে ডেবিট করা হয়।

(খ) দ্রব্যাদি ছাড়া অন্য কিছুর টাকা পরিশোধ সীমিত রাখা হয়েছে। এবং এর জন্যে বিশেষ অনুমতির দরকার হয় (অনুমোদিত ডিলার, যারা বিশেষ অনুমতি পেয়েছে, তারা ছাড়া)। ভারত ছাড়া ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্যে কোন দেশেই কোন বৈদেশিক মুদ্রা দেয়া হয় না। তবে যাতায়াতের পথে নামমাত্র কিছু খরচ দেয়া যেতে পারে। ভারতের বেলায় প্রতি বয়স্ক লোকের জন্যে ১০০ টাকা ও প্রতি অপ্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্যে ৫০ টাকা করে দেয়া হয়। যদি সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিমান পথে বছরে একবার ভারত ভ্রমণ করে। ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এই নিয়ম চালু করা হয়েছে। এই টাকা কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাংকে গচ্ছিত ভারতীয় টাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে দেয়া হয়।

ব্যবসার জন্যে বিদেশে গেলে স্বাভাবিক শর্তপূরণ সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা দেয়া হয়। চিকিৎসার জন্যেও বাইরে টাকা দেওয়া হয়, যদি এর জন্যে চিকিৎসা বোর্ড পরামর্শ দেয়। উচ্চতর শিক্ষার জন্যেও বৈদেশিক মুদ্রা দেয়া হয়।

(গ) ১৯৭২ সালে সরকার কর্তৃক হজ্বযাত্রীদের হজ্বপালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে

পরে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলারদের মাধ্যমে এর জন্যে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করেন।

(ঘ) বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকরা বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ (বেশীর পক্ষে ১৫০ পাউণ্ড) তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে পাঠাতে পারে।

(ঙ) অন-আবাসিক ভ্রমণকারীরা আগমনের সময় ঘোষণা করে তাদের সঙ্গে বাংলাদেশে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা অথবা ভ্রমণকারীর চেক (যদি এর কিছু অংশ ভাঙ্গিয়ে থাকে, তা বাদে) দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে। আবাসিক ভ্রমণকারীরা বাংলাদেশ ব্যাংক যত টাকার অনুমতি দেবে, ঠিক তত টাকারই বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে। বাংলাদেশের মুদ্রা রপ্তানী ও আমদানী নিষিদ্ধ। তবে বাংলাদেশের নাগরিকরা দেশের বাইরে যাওয়ার সময় অথবা দেশে প্রবেশ করার সময় ২০ টাকা পরিমাণ বাংলাদেশের মুদ্রা সাথে রাখতে পারবে। যদি কাষ্টমস্ বিভাগে ঘোষণা করা যায়, তাহলে যে কোন মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অভ্যন্তরে আনা যায়।

## ৬। আমদানী নীতি

**জানুয়ারী—জুন, ১৯৭২**

যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার জানুয়ারী—জুন, ১৯৭২ এই মৌসুমের প্রথম আমদানী নীতি ঘোষণা করেন। এতে পূর্ববর্তী লাইসেন্সযোগ্য তালিকা, অবাধ তালিকা, নগদ ও বোনাস তালিকা এবং বোনাস তালিকার পরিবর্তে একটি মাত্র আমদানীযোগ্য দ্রব্যের তালিকা ঘোষিত হয়। অবাধ তালিকা তুলে দেয়া হয়। এবং আমদানী লাইসেন্সের বিপরীতেই কেবলমাত্র আমদানীর অনুমতি দেয়া হয়।

আমদানীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১) যতদূর সম্ভব আমদানী সরকারী খাতে করা হবে।

২) মোটর গাড়ী, এয়ার কনডিশনার, রিফ্রিজারেটর, বৈদ্যুতিক চুল্লী, দামী ঘড়ি, দামী দেয়াল ঘড়ি, দামী কলম, প্রসাধনী দ্রব্য, চীনাবাসন, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩) সমস্ত শিল্পকে তাদের ছয় মাসের প্রয়োজনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানীর লাইসেন্স দেয়া হবে।

৪) বাণিজ্যিক আমদানীকারকের আলাদা তালিকা বাতিল করে সবার জন্যে সমান ভিত্তিতে নতুন করে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

৫) প্রত্যেক থানা থেকে কমপক্ষে দশজন নতুন আমদানীকারক নেয়া হবে। যাতে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আমদানী বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৬) অবাধ তালিকা, বোনাস তালিকা, নগদ ও বোনাস তালিকা বাতিল করে একটি মাত্র লাইসেন্সযোগ্য তালিকা তৈরী করা হয়।

৭) ব্যবসা সংগঠনের বাধ্যতামূলক সদস্য হওয়া ও বাধ্যতামূলক ইনডেন্টিং তুলে দেয়া হয়।

৮) বাণিজ্যিক আমদানীকারকদের অনধিক ২০,০০০ টাকা মূল্যের একটি মাত্র দ্রব্যের জন্যে আমদানী লাইসেন্স দেয়া হবে।

৯) প্রকৃত ব্যবহারকারীদের জন্যে আমদানী লাইসেন্স রাখা হয়েছে।

২৫৯ টি আমদানীযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে নতুন আমদানীকারকদেরকে মাত্র ৭৯টি দ্রব্য আমদানীর অনুমতি দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার জন্যে রাখা হয় ২১টি দ্রব্য। কেবলমাত্র প্রত্যয়পত্রের বিপরীতেই আমদানী করতে দেয়া হয়। ট্রাক্টর, শক্তি চালিত লাঙ্গল, কৃষির যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ কেবলমাত্র কৃষির জন্যেই আমদানী করা যাবে।

শিল্পের মালিকদের জন্যে তাদের পূর্ণ চাহিদার কাঁচা মাল ও যন্ত্রাংশ আমদানীতে কিস্তিতে টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা রাখা হয়। এর জন্যে নিম্নলিখিত শর্তপূরণ করতে হবে :

ক) যে মাল আমদানী হবে তার পরিমাণ কোনমতেই অর্ধবৎসরের মোট চাহিদার শতকরা ১০০ ভাগের বেশী হতে পারবে না।

খ) মাল পাঠানোর ছয়মাস পরে বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধের অনুমতি দেয়া হবে।

গ) বিশেষ ব্যবস্থায় আমদানী করার অনুমতি দরকার হলে, তা চলতি মৌসুমের জন্যে তার কোটা থেকে বাদ যাবে—এই শর্তে দেয়া যেতে পারে।

ঘ) আমদানীকারককে লাইসেন্স প্রদান—কর্তৃপক্ষের কাছে বিদেশী রপ্তানী-কারকের সাথে চুক্তিপত্রের নকলসহ বিশেষ ব্যবস্থার আমদানীর জন্যে দরখাস্ত করতে হবে।

বিস্ফোরক দ্রব্য, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, খালি গ্যাস সিলিণ্ডার ও গ্যাস সিলিণ্ডার—পূর্বাহ্নের অনুমতি ছাড়া আমদানী নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। নগদ, ঋণ, আগাম ও বিনিময় বাণিজ্যের অধীনে আমদানীর অনুমতি দেয়া হবে। বিশেষভাবে উল্লেখিত দেশ ছাড়া নগদ টাকায় সমস্ত দেশ থেকেই আমদানীর অনুমতি দেয়া হয়।

**জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭২**

১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত আমদানী নীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ছিলো :

১) শিল্পের জন্যে কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীর ব্যাপারে নিয়ম-কানুন আরো শিথিল করা হয়—যাতে উৎপাদন বাড়ে। এর জন্যে রপ্তানীমুখী শিল্পগুলোকে কাঁচামাল আমদানীর ব্যাপারে বেশী সুযোগ দেয়া হয়। যাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ছাঁচে বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে।

২) প্রথম আমদানী নীতির বিপরীতে এবারে শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানী-কারকদের জন্যে আলাদা আলাদা দুটো তালিকা তৈরী করা হয়।

৩) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থা এককভাবে ও ব্যক্তিগত খাতের ব্যবসায়ীদের সাথে যৌথভাবে যে সমস্ত দ্রব্যাদি আমদানী করতে পারবে, তাও আলাদাভাবে দেখানো হয়।

৪) উলের কাপড় আমদানীর জন্যে একমাত্র রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থাকেই অনুমতি দেয়া হয়।

৫) শিল্পগুলোকে তাদের ছয়মাসের চাহিদার পুরোটাই আমদানীর অনুমতি দেয়া হয়। কিছু কিছু শিল্পকে অবশ্য শতকরা ৫০ ভাগ আমদানীর অনুমতি দেয়া হয়।

৬) বিলাসদ্রব্য, যেমন—মোটর গাড়ী, রিফ্রিজারেটার, এয়ার কনডিশনার ইত্যাদির আমদানী এবারেও নিষিদ্ধ থাকে।

**জানুয়ারী-জুন, ১৯৭৩**

১৯৭৩ সালের জানুয়ারী-জুন মৌসুমের আমদানী নীতির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ছিলো :

১) ২১৯ কোটি টাকার পণ্য-দ্রব্য আমদানী করা হবে।

২) বিলাস দ্রব্য, যেমন—মোটর গাড়ী, এয়ার কণ্ডিশনার ইত্যাদি আমদানী বন্ধ থাকে।

৩) ঔষধ, কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের জন্যে আবার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

৪) প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ছয় মাসের পুরো চাহিদা মাফিক কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানীর অনুমতি দেয়া হয়।

৫) বারোটা নতুন দ্রব্য (শস্য তেল, শুক রং ও পিগমেন্টসহ) আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

# প্রশাসন, মুদ্রা
# ও
# হিসাব

## ১। গভর্নর নিয়োগ

১৯৭২ সালের ১৪ই জানুয়ারী থেকে জনাব আ. ন. হামিদুল্লাহ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত হন।

## ২। চাকরির শর্তাবলীর উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কাজ

প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারদেরকেও সারা বাংলাদেশ ভিত্তিতে বিচার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

**বৃত্তির পরিকল্পনা**

কম বেতনভুক কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দেয়ার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 'ডি' শ্রেণীর কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের বৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এইখাতে ৬০,৯৫০ টাকা বরাদ্দ করে। যেকোন 'ডি' শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী তার তিন সন্তান পর্যন্ত এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তার অবশ্যই তিন বছরের সেবাদানের কৃতিত্ব থাকতে হবে।

**ভোক্তাদের সমবায় সমিতি**

দেশের বর্তমান অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ও সমস্ত জিনিসের দামের ঊর্ধ্বগতির ফলে ; ব্যাংকের কর্মচারীরা নির্দিষ্ট আয়ের লোক হিসাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে তাদের সত্যিকার আয় হ্রাস কমে। এ ব্যাপারে ব্যাংকের কিছু করণীয় আছে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক তার বিভিন্ন শাখায় সমবায় স্থাপনের উদ্দেশ্যে নানা সাহায্য ও উৎসাহ দেয়।

## ৩। ব্যাংক-ব্যবসায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের 'ব্যাংক ব্যবসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ' ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দিত। এই রকম কোন বিভাগ বাংলাদেশে ছিলোনা। তাই স্বাধীনতার পর ব্যাংকের অফিসারদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমস্ত ব্যাংকের সহায়তায় অচিরেই ১৯৭২ সালের জুন মাসে পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্যে একটি ব্যাংকার ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৩

সালের জুন মাসে এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ৭০০ প্রার্থীর প্রথম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষা গ্রহণ করে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্যে ব্যাংক এই পর্যন্ত ৩ জন অফিসারকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ওয়াশিংটনস্থ ইনষ্টিটিউটে পাঠায়। ২ জনকে পাঠানো হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের রিজার্ভ ব্যাংকে। কলম্বো পরিকল্পনার অধীনে তারা সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করবে।

## ৪। কার্যালয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা

বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ব্যাংকের নিজস্ব অফিস ও ষ্টাফ কোয়ার্টার রয়েছে। বগুড়া ও সিলেটে ব্যাংকের ভাড়াটে অফিস বাড়ী রয়েছে। রাজশাহীস্থ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ শাখা একটি বিদ্যালয় ভবনে অবস্থিত। এই ভবনটি (৪·০৫ একর জমিসহ) ১৯৭০ সালে ব্যাংক ক্রয় করে নিয়েছে। রাজশাহীর এই বাড়ীটিকে পুরোপুরি ব্যাংকিং বিভাগের কাজ চালানোর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংক বগুড়া ও সিলেটে অফিসের দালান এবং বগুড়া ও ঢাকায় ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের কাজও হাতে নিয়েছে। ঢাকায় প্রধান অফিসের সম্প্রসারণ কাজও এগিয়ে চলেছে।

## ৫। ব্যাংক নোট

স্বাধীনতার পরে চালু পাকিস্তানী মুদ্রা আস্তে আস্তে তুলে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ও বাংলাদেশের একটি চিত্রসহ বাংলাদেশের নিজস্ব ১০০,১০ ও ৫ টাকার মুদ্রা ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ বাজারে ছাড়া হয়। পরবর্তী সময়ে ৪ঠা মার্চের পর যে সমস্ত নোট বাজারে ছাড়া হয়েছিলো, সেগুলো তুলে নেয়া হয়। কারণ, জরুরী ভিত্তিতে ছাপানোর ফলে এতে সমস্ত প্রকার নিরাপত্তার বিধান রাখা যায়নি। এর বদলে নিরাপত্তা মার্কসহ বাংলাদেশের নতুন মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়।

## ৬। মুদ্রা প্রত্যাহার

### ১) পাকিস্তানী ৫০ টাকার নোট

৫০ টাকার পাকিস্তানী নোট ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২০ নং আদেশবলে সেই বছরেরই ৫ই মার্চ থেকে প্রত্যাহার করা হয়। এবং ৫০ টাকার পাকিস্তানী নোটের মালিকদেরকে তাদের টাকা যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাংক, পোষ্ট-অফিস অথবা

সাব-পোষ্ট অফিসে জমা দেয়ার জন্য বলা হয়। নোটগুলো ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের ৬, ৭ ও ৮ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও পোষ্টঅফিসগুলোকে তাদের নগদ-বাক্সে কতটাকা পরিমাণের ৫০ টাকার পাকিস্তানী নোট আছে, তা ঘোষণা করার জন্যে বলা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চে বাজারে পাকিস্তানী ৫০ টাকার নোটের পরিমাণ ছিলো—৮২,৮১,৮৬,৭০০। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও পোষ্ট অফিসের নগদ টাকার ঘোষণাসহ মোট—৬৩,৭১,৭৬,৬০০ টাকার নোট জমা হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী ও সরকারী প্রতিষ্ঠান ৫০ টাকার নোট জমা দিয়েছিলো, তাদেরকে মোট ৬০,৫৯,৯০,৭৫০ টাকার নতুন নোট দিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকী টাকা পরিশোধের ব্যাপারটি এগিয়ে যাচ্ছে।

**২) পাকিস্তানী ১০ ও ৫ টাকার নোট**

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৬১ দ্বারা সেই সালেরই ৮ই জুন থেকে পাকিস্তানী ১০ ও ৫ টাকার নোট বাতিল করা হয়। বাতিল ঘোষণার দিনে সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানী ১০ ও ৫ টাকার নোটের পরিমাণ ছিলো—১৩৩,৯৮,১৫,০৩৫। ১০ ও ৫ টাকার ধারক মালিকদের ৮ই জুন থেকে ১৪ই জুনের মধ্যে তাদের টাকা যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের যেকোন শাখায়, অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়াস্থ যেকোন অফিসে, অথবা যেকোন ট্রেজারী অথবা যেকোন পোষ্ট অফিস ও সাব-পোষ্ট অফিসে জমা দেয়ার জন্যে বলা হয়।

জমাকৃত ১০ ও ৫ টাকার নোটের পরিমাণ হোল মাত্র—১১৬,৮৮,৭০,৪১০।

**৩) ১ ও ২ টাকার পাকিস্তানী নোট**

১৯৭৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে পাকিস্তানী ১ ও ২ টাকার নোট বাতিল করা হয়। এই সমস্ত নোটের বদলে ১৯৭৩ সালের ২২শে মার্চ পর্যন্ত নতুন নোট দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়ার শাখাগুলো, সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারীর কার্যরত অফিসগুলো, পিরোজপুর, মেহেরপুরের সাব-ট্রেজারীগুলো এই দায়িত্ব পালন করে। মোট—৩·১৯ কোটি টাকার ১ ও ২ টাকার নোট জমা হয়।

**৪) প্রথমবারের বাজারে ছাড়া নোট প্রত্যাহার**

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চে বাজারে ছাড়া ১০০, ১০ ও ৫ টাকার নোটগুলো ১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে মে তারিখের মধ্যে বাজার থেকে তুলে নেয়া হয়।

কারণ, স্বাধীনতার পর জরুরী চাহিদা মেটানোর জন্যে তাড়াহুড়া করে নোট ছাপানোর ফলে এগুলোতে যথেষ্ট নিরাপত্তা মার্ক দেয়া সম্ভব হয়নি। প্রথমাবস্থায় ১০০, ১০ ও ৫ টাকার যে নোটগুলো বাজারে ছাড়া হয়েছিলো তা মোট ৩৯১,৪৭,৫০,০০০ কোটি টাকা পরিমাণের ছাপা হয়েছিলো। কিন্তু বাজারে ছাড়া হয়েছিলো—২৭০,৭৫,৪৯,৫০০ কোটি টাকা। এগুলো প্রত্যাহার করে নেয়ার পর বাজার থেকে ফেরত আসে ২৭০,২১,৯৪,৬৬০ কোটি টাকা।

## ৭। মুদ্রা

নিকেলের কাঁচা টাকাসহ অন্যান্য পাকিস্তানী মুদ্রা এখনো আমাদের মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু মুদ্রার পরিমাণ ছিলো মাত্র ৫·৬৩ কোটি টাকা। এছাড়া, একই তারিখে বাংলাদেশের ১ টাকার নোট চালু ছিলো ১৭·৬০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের নিজস্ব মুদ্রা চালুর ব্যবস্থা হচ্ছে। *ইতিমধ্যেই ৫ ও ১০ পয়সার মুদ্রা বাজারে চালু হয়েছে।

## ৮। ব্যাংকিং বিভাগ

১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন তারিখানুযায়ী ব্যাংকিং বিভাগের একটি ব্যালেন্স শীট দেয়া হচ্ছে। সেখানে রিজার্ভ ফাণ্ড হিসাবে ৩ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২-এর ৫৯ নং ধারামতে একে ব্যালেন্স শীটের দায়ের খাতে দেখানো হয়েছে। আইনসম্মত অনেক ফাণ্ড এখানে উল্লেখিত আছে। এগুলো হিসাব অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনে ব্যাংকে আমানতের পরিমাণ ছিলো ১০৪·৭৪ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিলো মাত্র ৬৯·৪৮ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, অন্যান্য আমানত, যেমন—আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (আই.বি.আর.ডি) ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাব ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে ১৪৩·৪৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনে তা ছিলো মাত্র ৭৮·৭১ কোটি টাকা।

সম্পদ খাতে দেখা যায়—বাংলাদেশের বাইরে আমানত ছিলো—৫৯·১৬ কোটি টাকা। অথচ ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিলো—৫০·০৯ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে সরকারকে প্রদত্ত আগাম ও ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ কোটি টাকা। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিলো—১৫·৯৩ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের

---

*১৯৭৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে

৩০শে জুনে সরকারী ডেটর ব্যালেন্স ছিলো—১০·৫০ কোটি টাকা। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনে সরকারী কোন ডেটর ব্যালেন্স ছিলো না। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে অন্যান্য ঋণ ও আগাম খাতে ব্যালেন্স ছিলো—৪৯·৭৯ কোটি টাকা। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিলো—৪৪·৩৮ কোটি টাকা। ব্যাংকের লগ্নি ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনে ছিলো—২·৬৩ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে লগ্নির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৩·৯৮ কোটি টাকা।

## ৯। ইস্যু বিভাগ

১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন অনুযায়ী ইস্যু বিভাগের ব্যালেন্স শীট দেয়া হোল। এই তারিখে মোট ইস্যুকৃত নোটের পরিমাণ ছিলো— ২৮৫·২৬ কোটি টাকা। এর বিপরীতে ৬০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা ছিলো, ১২·৮৫ কোটি টাকার টাকা-মুদ্রা ছিলো, আর ছিলো— ২১২·৪১ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের নিশ্চয়তাপত্র (ট্রেজারী বিলের মাধ্যমে), ১৯৭২ সালের ৩০শে জুনে মোট ইস্যুকৃত নোটের পরিমাণ ছিলো— ১৯৫·২৫ কোটি টাকা। এর বিপরীতে অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা ছিলো— ৬০·৪০ কোটি টাকা আর ছিলো— ১৩৪·৮৫ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের নিশ্চয়তা।

## ১০। বার্ষিক হিসাব

১৬-১২-৭১ তারিখ থেকে ৩০-৬-৭২ তারিখ পর্যন্ত সময়ের লাভ ও ক্ষতির হিসাব ও ব্যালেন্স শীট দেয়া হোল। ব্যাংকের লাভ ও ক্ষতির হিসাব নিম্নলিখিত-ভাবে করা যায়:

| | | |
|---|---|---|
| মোট আয় | টাঃ | ৩,০৮,৮৭,৯১৫·০১ |
| মোট ব্যয় | টাঃ | ২,০০,৭২,৭৩৬·৬৫ |
| লাভ অথবা মুনাফা | টাঃ | ১,০৮,১৫,১৭৮.৩৬ |

মোট লাভ ১,০৮,১৫,১৭৮·৩৬ থেকে সরকারকে দেয়া হয়েছে— ৫৮,১৫,১৭৮·৩৬ টাকা এবং ৫০ লাখ টাকা আগামী বছরের হিসাবে দেখানো হয়েছে।

৩০-৬-১৯৭৩ তারিখ শেষ হওয়া বছরের লাভ ও ক্ষতির হিসাব ৭৪ পৃষ্ঠায় দেয়া হোল:

১৯৭২ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের লাভ-ক্ষতির হিসাব নিম্নরূপ:

| | | |
|---|---|---|
| মোট আয় : | টাকা | ১৪,৬৫,৩৭,০৭৫.০০ |
| মোট ব্যয় : | টাকা | ৫,২২,৩৫,২৪০.০০ |
| মোট লাভ : | | ৯,৪৩,০১,৮৩৫.০০ |
| গত বছরের মুনাফা | | ৫০,০০,০০০.০০ |
| মোট : | | ৯,৯৩,০১,৮৩৫.০০ |

মোট লাভ ৯,৯৩,০১,৮৩৫.০০ টাকার মধ্যে সরকারকে ৫,৬৮,০১,৮৩৫.০০ টাকা দিয়ে দেয়া হবে। বাকীটা আইনসম্মত ফাণ্ডগঠনে লাগানো হবে।

| | | |
|---|---|---|
| গ্রামীণ ঋণ ফাণ্ড | : টাকা | ৭৫,০০,০০০.০০ |
| কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ ফাণ্ড | : টাকা | ৫০,০০,০০০.০০ |
| শিল্প ঋণ ফাণ্ড | : টাকা | ১,৫০,০০,০০০.০০ |
| রপ্তানী ঋণ ফাণ্ড | : টাকা | ১,৫০,০০,০০০.০০ |
| | টাকা | ৪,২৫,০০,০০০.০০ |

## ১১। নিরীক্ষক নিয়োগ

১৬-১২-৭১ সাল থেকে ৩০-৬-৭২ সাল পর্যন্ত সময়ের ব্যাংক হিসাব ঢাকাস্থ মেসার্স রহমান, রহমান, হক এণ্ড কোম্পানী ও মেসার্স হোসেন, আলম, কাশেম এণ্ড কোম্পানী, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট দ্বারা নিরীক্ষিত হয়েছে। এতে সরকারের সম্মতি ছিলো। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২-এর ৬৫(১) ধারা মতে সরকার মেসার্স এস. এফ. আহমেদ এণ্ড কোম্পানী ও মেসার্স হোসেন, আলম, কাশেম, খালেক নামক দুটো চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম দ্বারা ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে শেষ হওয়া বছরের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়।

## ১২। সর্বশেষ

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার পর ব্যাংকের কর্মচারী ও ষ্টাফ সদস্যরা পরম নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালেন্স শীট

এবং

লাভ-ক্ষতির হিসাব

৩০শে, জুন, ১৯৭২

## ব্যালেন্স শীট

**৩০শে জুন,**

| দায়সমূহ | টাকা | টাকা |
|---|---|---|
| ব্যাংকিং বিভাগে জমাকৃত নোট | ৭,০৪,১০,৫১৬ | |
| বাজারে চালু নোট* | ১৮৮,২০,৫৯,৬৯৯ | |
| মোট ইস্যুকৃত নোট | | ১৯৫,২৪,৭০,২১৫ |
| মোট দায় | টাকা | ১৯৫,২৪,৭০,২১৫ |

* এখানে উল্লেখিত বাজারে চালু নোটের পরিমাণের সাথে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান/পাকিস্তান সরকারের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংক/বাংলাদেশ সরকার বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোটের যে ক্ষতিপূরণ ও মূল্য চাইবে তার কোন হুবহু মিল নেই।

## ইস্যু বিভাগ

১৯৭২

| সম্পদসমূহ | টাকা | টাকা |
|---|---|---|
| ১ক) স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণপিণ্ড | — | |
| রৌপ্য | — | |
| আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে এসডি আর | — | |
| অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা | ৬০,৪০,২৮,০০০ | ৬০,৪০,২৮,০০০ |
| খ) টাকা-মুদ্রা | — | |
| বাংলাদেশ সরকারের নিশ্চয়তা পত্র ** | ১৩৪,৮৪,৪২,২১৫ | |
| আভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্র | — | ১৩৪,৮৪,৪২,২১৫ |
| | | ১৯৫,২৪,৭০,২১৫ |

** পাকিস্তানী নোটের বদলে বাংলাদেশের নোট চালু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিল।

## ব্যালেন্স শীট

৩০শে জুন,

| দায়সমূহ | টাকা |
|---|---|
| পরিশোধিত মূলধন | ৩,০০,০০,০০০ |
| রিজার্ভ ফাণ্ড | — |
| গ্রামীণ ঋণ ফাণ্ড | — |
| শিল্প ঋণ ফাণ্ড | — |
| রপ্তানী ঋণ ফাণ্ড | — |
| কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ ফাণ্ড | — |
| আমানত : | |
| ক) সরকার | ৫০,০৯,০৪৯ |
| খ) ব্যাংক | ১০৪,৭৪,৪৮,৯০৭ |
| গ) অন্যান্য | ৭৮,৭১,০১,৫০৫ |
| এসডিআর-এর বরাদ্দ | — |
| দেয় বিল | ১৭,৫৬,২৮৯ |
| অন্যান্য দায় | ৬৭,৯৯,১১,৬৮৫ |
| মোট দায় | ২৫৫,১২,৫১,৪৩৫ |

## ব্যাংকিং বিভাগ

১৯৭২

| সম্পদসমূহ | টাকা |
|---|---|
| নোটসমূহ | ৭,০৪,১০,৫১৬ |
| টাকা মুদ্রা | ১,৭১,৫৭৬ |
| সহকারী মুদ্রা | ১,৫৬,২৬৮ |
| ক্রীত ও বাটাকৃত বিলসমূহ : | |
| ক) আভ্যন্তরীণ | ৯৮,৭৬,৭১২ |
| খ) বৈদেশিক | — |
| গ) সরকারী ট্রেজারী বিল | — |
| বাংলাদেশের বাইরে ব্যালেন্স | ৫০,০৯,৪৬,৬৮৬ |
| এসডিআর ( আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ) | — |
| সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম | ১৫,৯১,০০,০০০ |
| সরকারী ডেটর ব্যালেন্স | — |
| অন্যান্য ঋণ ও আগাম | ৪৪,১৮,৪৮,১০০ |
| লগ্নি | ২,৬১,১১,০০০ |
| অন্যান্য সম্পদ | ১১৪,০২,১০,১৭৭ |
| মোট সম্পদ | ২৫৫,১২,৫১,৪১৫ |

## লাভ-ক্ষতির হিসাব
## বৎসরান্ত ৩০শে জুন, ১৯৭২

| | |
|---|---|
| **আয়** | |
| সুদ, বাটা, বিনিময়, কমিশন ইত্যাদি | ৩,০৮,৮৭,৯১৫ |
| **খরচ** | |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ৭৯,৩৯,৭৮৯ |
| পরিচালকদের বেতন ও খরচ | — |
| নিরীক্ষকদের ফি | ১০,০০০ |
| ভাড়া, ট্যাক্স, বীমা ও বিদ্যুৎ | ৪,৫৪,৫৬৯ |
| আইন খরচ | — |
| পোষ্ট ও টেলিগ্রাম খরচ | ৭৭,৯২১ |
| নগদ টাকা প্রেরণ | ২,৬৭,০৪৩ |
| ষ্টেশনারী ইত্যাদি | ১,৪০,১৬৯ |
| নিরাপত্তা প্রিন্টিং (চেক, নোট, ফরম ইত্যাদি) | ৭২,৯৭,৬৯৬ |
| ব্যাংকের সম্পত্তির অবক্ষয় ও মেরামত | ১১,১০,৯২৪ |
| এজেন্সী খরচ | ৯,৭৫,১২৬ |
| ষ্টাফ ও সুপারএন্যুয়েশন ফাণ্ডে দান | — |
| বিবিধ খরচ | ১৭,৯৯,৫০০ |
| নীট ব্যালেন্স | ১,০৮,১৫,১৭৮ |
| | মোট ৩,০৮,৮৭,৯১৫ |
| রিজার্ভ ফাণ্ডে হস্তান্তর | — |
| গ্রামীণ ঋণ ফাণ্ডে জমা | — |
| শিল্প ঋণ ফাণ্ডে জমা | — |
| রপ্তানী ঋণ ফাণ্ডে জমা | — |
| কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ ফাণ্ডে জমা | — |
| সরকারকে প্রদত্ত টাকা | ১,০৮,১৫,১৭৮ |
| ব্যালেন্স | — |
| | মোট ১,০৮,১৫,১৭৮ |

## রিজার্ভ ফাণ্ড হিসাব

| | |
|---|---|
| আনীত ব্যালেন্স | — |
| লাভ-ক্ষতির হিসাব থেকে আনীত | -- |
| মোট টাকা | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এল. কিউ. চৌধুরী | এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায় | কে. এ. রশীদ | আ. ন. হামিদুল্লাহ |
| হিসাব পরিচালক | কার্যকরী ডাইরেক্টর | ডেপুটি গভর্নর | গভর্নর |

# হিসাব নিরীক্ষকদের বিবরণী

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে,

আমরা, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নস্বাক্ষরকারী হিসাব নিরীক্ষকগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন তারিখে তৈরী ব্যালেন্সশীট ও হিসাবের বিবরণ দিচ্ছি।

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়াস্থ কার্যালয়সমূহের হিসাব, সার্টিফিকেট ও ভাউচারসহ ব্যালেন্সশীট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। এই সমস্ত হিসাব, সার্টিফিকেট ও ভাউচারসমূহ যথারীতি সিলেট ও রাজশাহীস্থ সহকারী নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পরিবেশিত ও প্রশংসিত। এগুলো ব্যালেন্সশীটে দেয়া আছে। এখানে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমরা যেখানে ও যখনই কোন ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি চেয়েছি, তখনই তা পেয়েছি। প্রাপ্ত ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি সন্তোষজনক। আমাদের মতে ব্যালেন্সশীট আইনসম্মত ও সত্য। সত্যিকার অবস্থা জানার উপযোগী সমস্ত খবর ও তথ্যাদিসহ ব্যালেন্সশীট তৈরী করা হয়েছে। আমরা যা তথ্যাদি পেয়েছি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের বইতে যা দেখানো হয়েছে, আমাদের বিবরণী এরই উপর ভিত্তি করা।

ঢাকা,
৮ই অক্টোবর,
১৯৭১

হোসেন, আলম,
কাশেম, খালেক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট

রহমান, রহমান, হক
এণ্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট

ব্যালেন্স-শীট

ও

লাভ-ক্ষতির হিসাব

৩০শে জুন, ১৯৭৩

ব্যালেন্স শীট

৩০শে জুন,

| দায়সমূহ | টাকা | টাকা |
|---|---|---|
| ব্যাংকিং বিভাগে জমাকৃত নোট | ১,০০,৮১,৭৭০ | |
| বাজারে চালু নোট* | ২৮৪,২৪,৮৪,০৬০ | |
| মোট ইস্যুকৃত নোট | | ২৮৫,২৫,৬৫,৮৩০ |
| মোট দায় | টাকা | ২৮৫,২৫,৬৫,৮৩০ |

*এখানে উল্লেখিত বাজারে চালু নোটের পরিমাণের সাথে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান/পাকিস্তান সরকারের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংক/বাংলাদেশ সরকার বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোটের যে ক্ষতিপূরণ ও মূল্য চাইবে তার কোন হুবহু মিল নেই।

## ইস্যু বিভাগ

১৯৭৩

| সম্পদসমূহ | টাকা | টাকা |
|---|---|---|
| ক) স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণপিণ্ড | — | — |
| রৌপ্য | — | — |
| আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে এসডি আর | — | — |
| অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা | ৬০,০০,০০,০০০ | ৬০,০০,০০,০০০ |
| খ) টাকা-মুদ্রা | ১২,৮৪,৭৬,৮৮৯ | |
| বাংলাদেশ সরকারের নিশ্চয়তাপত্র * * | ২১২,৪০,৮৮,৯৪১ | |
| আভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিকপত্র | — | ২২৫,২৫,৬৫,৮৩০ |
| মোট সম্পদ | | ২৮৫,২৫,৬৫,৮৩০ |

* *পাকিস্তানী নোটের বদলে বাংলাদেশের নোট চালু করার জন্যে সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এড্‌হক ট্রেজারী বিল।

## ব্যালেন্স শীট

**৩০শে জুন,**

| দায়সমূহ | টাকা |
|---|---|
| পরিশোধিত মূলধন | ৩,০০,০০,০০০ |
| রিজার্ভ ফান্ড | ৩,০০,০০,০০০ |
| গ্রামীণ ঋণ ফান্ড | ৭৫,০০,০০০ |
| শিল্প-ঋণ ফান্ড | ১,৫০,০০,০০০ |
| রপ্তানী ঋণ ফান্ড | ১,৫০,০০,০০০ |
| কৃষি-ঋণ স্থিতিশীলকরণ ফান্ড | ৫০,০০,০০০ |
| আমানতসমূহ | |
| ক) সরকারি | — |
| খ) ব্যাংক | ৬৯,৪৮,৩৮,৪৯২ |
| গ) অন্যান্য | ১৩৯,২৩,৭০,০২৭ |
| এস. ডি. আর-এর বরাদ্দ | — |
| দেয় বিল | ১৬,৪৪,০৬৬ |
| অন্যান্য দায় | ২,৪০,৬৮,৭৫৩ |
| মোট দায় | ২২১,৫৪,২১,৩৩৮ |

## ব্যাংকিং বিভাগ

১৯৭৩

| সম্পদসমূহ | টাকা |
|---|---|
| নোটসমূহ | ১,০০,৮১,৭৭০ |
| টাকা-মুদ্রা | ১,২৮,৯৫২ |
| সহকারী মুদ্রা | ১,৭৫,২০৮ |
| ক্রীত ও বাটাকৃত বিলসমূহ :— | |
| ক) আভ্যন্তরীণ | ৯,০০,০০,০০০ |
| খ) বৈদেশিক | — |
| গ) সরকারী ট্রেজারী বিল | — |
| বাংলাদেশের বাহিরে ব্যালেন্স* | ৫৯,১৬,২৫,০৮৪ |
| এসডিআর (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) | — |
| সরকারকে প্রদত্ত আগাম ও ঋণ | ২০,০০,০০,০০০ |
| সরকারকে ডেটর ব্যালেন্স | ১০,৫০,৪৮,৯৫১ |
| অন্যান্য আগাম ও ঋণ | ৪৯,৭৯,০১,২৫০ |
| লগ্নি | ৫৩,৯৭,৭৩,৮৩৫ |
| অন্যান্য সম্পদ | ১৮,০৬,৮৬,২৮৬ |
| মোট সম্পদ | ২২১,৫৪,২১,৩৩৮ |

* নগদ টাকা ও স্বল্প মেয়াদী নিশ্চয়তাপত্রসহ

# লাভ-ক্ষতির হিসাব

## বৎসরান্ত ৩০শে জুন, ১৯৭৩

### আয়

সুদ, বাটা, বিনিময়, কমিশন ইত্যাদি টাকা : ১৪,৬৫,৩৭,০৭৫

### খরচ

| | |
|---|---|
| প্রাতিষ্ঠানিক | টাকা ১,৬৬,৭২,১৭৬ |
| পরিচালকদের ফি ও খরচ | টাকা — |
| নিরীক্ষকদের ফি | টাকা ১০,০০০ |
| ভাড়া, ট্যাক্স, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি | টাকা ৯,১২,৭৯৯ |
| আইন খরচ | টাকা ৩৬,১৯৯ |
| পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ খরচ | টাকা ১,০৬,৫০৪ |
| নগদ টাকা প্রেরণ | টাকা ২,৯৬,৮৪০ |
| ষ্টেশনারী ইত্যাদি | টাকা ৩,৩৬,৬৬৮ |
| নিরাপত্তা প্রিন্টিং (চেক, নোট, ফরম ইত্যাদি) | টাকা ২,৩৬,৩২,০১৫ |
| সম্পত্তি অবক্ষয় ও মেরামত | টাকা ২৪,৪৯,৭৫১ |
| এজেন্সী খরচ | টাকা ১৫,৩১,০২৩ |
| ষ্টাফদের প্রতি অনুদান | টাকা — |
| বিবিধ খরচ | টাকা ৬২,৫১,২৬৫ |
| নীট ব্যালেন্স | টাকা ৯,৪৩,০১,৮৩৫ |
| | মোট টাকা : ১৪,৬৫,৩৭,০৭৫ |

| | |
|---|---|
| রিজার্ভ ফাণ্ডে হস্তান্তরিত | — |
| গ্রামীণ-ঋণ ফাণ্ডে হস্তান্তর | ৭৫,০০,০০০ |
| শিল্প-ঋণ ফাণ্ড গঠন | ১,৫০,০০,০০০ |
| রপ্তানী-ঋণ ফাণ্ড | ১,৫০,০০,০০০ |
| কৃষি-স্থিতিশীলকরণ ফাণ্ড | ৫০,০০,০০০ |
| সরকারকে প্রদত্ত টাকা | ৫,১৮,০১,৮৩৫ |
| ব্যালেন্স | — |
| | মোট ৯,৪৩,০১,৮৩৫ |

## রিজার্ভ ফাণ্ড হিসাব

| | | |
|---|---|---|
| ৩০শে জুন, ১৯৭২-এর ব্যালেন্স | | — |
| লাভ-ক্ষতির হিসাব থেকে আনীত | | — |
| | মোট | — |

| এল. কিউ. চৌধুরী | এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায় | কে. এ. রশীদ | আ. ন. হামিদুল্লাহ |
|---|---|---|---|
| হিসাব পরিচালক | কার্যকরী পরিচালক | ডিপুটি গভর্নর | গভর্নর |

# হিসাব নিরীক্ষকদের বিবরণী

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে,

আমরা, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নস্বাক্ষরকারী হিসাব-নিরীক্ষকগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে তৈরী ব্যালেন্স-শীট ও হিসাবের বিবরণ দিচ্ছি।

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়াস্থ কার্যালয়সমূহের হিসাব, সার্টিফিকেট ও ভাউচারসহ ব্যালেন্স শীট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। এই সমস্ত হিসাব, সার্টিফিকেট ও ভাউচারসমূহ যথারীতি সিলেট ও রাজশাহীস্থ সহকারী নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পরিবেশিত ও প্রশংসিত। এগুলো ব্যালেন্স শীটে দেয়া আছে। এখানে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমরা যেখানে ও যখনই কোন ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি চেয়েছি, তখনই তা পেয়েছি। ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি সন্তোষজনক। আমাদের মতে ব্যালেন্স শীট আইনসম্মত ও সত্য। সত্যিকার অবস্থা জানার উপযোগী সমস্ত খবর ও তথ্যাদিসহ ব্যালেন্স শীট তৈরী করা হয়েছে। আমরা যা তথ্যাদি পেয়েছি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের বইতে যা দেখানো হয়েছে, আমাদের বিবরণী এরই উপর ভিত্তি করা।

| | | |
|---|---|---|
| ঢাকা, ৮ই অক্টোবর, ১৯৭৩ | হোসেন, আলম, কাশেম, খালেক<br>চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্‌ | এস. এফ. আহমেদ এণ্ড কোং<br>চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্‌ |

## তপশিলী ব্যাংকগুলোর তুলনামূলক অবস্থা

কোটি টাকার হিসাবে

| বিবরণসমূহ | নিম্নলিখিত তারিখে টাকার পরিমাণ | | |
|---|---|---|---|
| | ১৭-১২-১৯৭১ | ৩০-৬-১৯৭২ | ২৯-৬-১৯৭৩ |
| তলবী দায়সমূহ | ১৮০.৯০ | ৩১০.১০ | ৪০৯.৬০ |
| দীর্ঘ মেয়াদী দায়সমূহ | ১৫৮.৫২ | ২১৩.৫১ | ২৯৩.০৮ |
| মোট : | ৩৩৯.৪২ | ৫২৩.৬১ | ৭০২.৬৮ |
| বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ | ৬৬.৯০ | ৩৯.১১ | ৪৬.৮৫ |
| নগদ অর্থ | ৪.০৬ | ৩৫.৬১ | ১৮.৯৬ |
| বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ | ১৭.০১ | ১০৩.২২ | ৬৫.৮৪ |
| বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংকের চলতি হিসাবে আমানত | ৩.৫৮ | ১৫.৭২ | ৯.৪৬ |
| বাংলাদেশে স্বল্প-নোটিশ ও তলবী অর্থ | ৯.০০ | ৬.৬৫ | ২১.৭২ |
| বাংলাদেশে বিনিয়োগ | ৪২.৮১ | ৫৫.৩৭ | ১৪৫.৯৬ |
| বাংলাদেশে মোট আগাম-ঋণ | ৩৮৮.৩১ | ৩৮৮.৫১ | ৫৫৪.২৫ |
| বাংলাদেশে ক্রীত ও বাটাকৃত আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বিল | ৩৬.৮৬ | ৩৮.১০ | ৫৮.৩০ |

# তপশিলী ব্যাংকগুলোর নাম

( ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন তারিখ অনুযায়ী )

ক. জাতীয় ব্যাংকসমূহ

বানিজ্যিক ব্যাংক :

১ ) সোনালী ব্যাংক
২ ) রূপালী ব্যাংক
৩ ) অগ্রণী ব্যাংক
৪ ) জনতা ব্যাংক
৫ ) পূবালী ব্যাংক
৬ ) উত্তরা ব্যাংক

বিশেষায়িত ব্যাংক :

১ ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
২ ) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

খ. ভারতীয় ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য বিদেশী ব্যাংক

১ ) ন্যাশন্যাল এণ্ড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাংক
২ ) চার্টার্ড ব্যাংক
৩ ) অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যাংকিং কর্পোরেশন

গ. ভারতীয় ব্যাংক* (কার্যরত নয়)

১ ) ব্যাংক অব বরোদা
২ ) সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
৩ ) ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া
৪ ) ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া
৫ ) ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্যাংক লিঃ

---

* ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে সরকারী তত্ত্বাবধায়কের ব্যবস্থাপনায়।